খবর ৩৬৫ দিনের সঙ্গে বিনামূল্যে

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩

রবি

তৃষ্ণা বসাক
কমলেশ রায়
অর্ণব সাহা

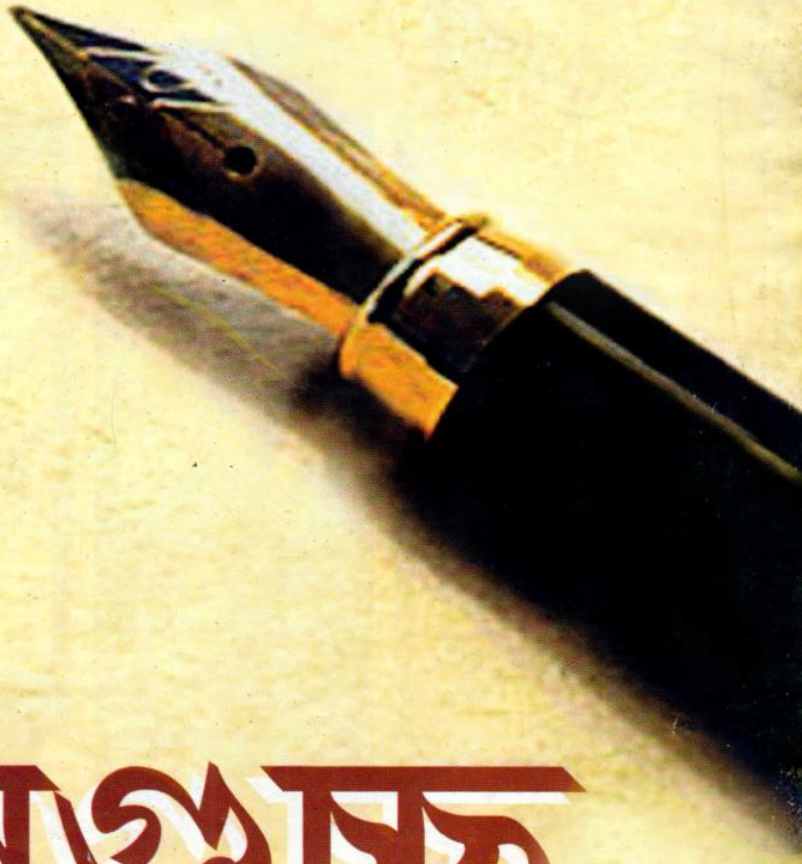

গল্পগুচ্ছ

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

GiONEE
SMART PHONE

CELEBRATE

VICTORY OVER THE ORDINARY WITH THE

ELIFE E5 AND E3

ELIFE E5

- 1.5 GHz Quad Core
- Ultra Slim 6.85 mm
- Super AMOLED HD Screen
- 8 MP FHD + 5 MP HD Camera
- DTS 3D Surround Sound
- OTA • Android v4.2
- 16 GB Built-in Memory

Best Buy ₹18,999/-

ELIFE E3

- 1.2 GHz Quad Core
- Ultra Slim 7.9 mm
- IPS HD Screen
- 8 MP + 2 MP FHD Camera
- DTS 3D Surround Sound
- OTA • Android v4.2 Jelly Bean
- 16 GB Built-in Memory

Best Buy ₹14,999/-

www.brandcurry.co.in

India Headquarters: SYNTECH TECHNOLOGY PVT. LTD., F-2, Block No. B-1, Ground Floor, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi - 110044

own Design Manufacturing R&D

/gioneeindia gionee.co.in

Toll free: 1800 208 1166

Gionee supports Leukemia Crusaders. Gionee contributes a part of its proceeds to fight Leukemia amongst children.

Regional Partner: United Teleservices Ltd.,
113, Park Street, 6th Floor, Kolkata - 700016

For trade enquiries and other details in West Bengal contact Mr. Abhishek Paul at +91 9836431181

খবর ৩৬৫ দিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

রবি

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ | বর্ষ ২ | সংখ্যা ৩১

গল্প গুচ্ছ

প্রচ্ছদ ৪

গল্পগুচ্ছ

গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালের। ছোটগল্প নামক আঙ্গিকটি অবশ্য কেবল গল্প নয়। বরং গল্পকে শরীরে ধারণ করেও শেষ পর্যন্ত তাকে অতিক্রম করে যাওয়াই ছোটগল্পের আসল উদ্দেশ্য। তবে গল্পের মধ্যে গল্পত্ব থাকতেই হবে। ছোটগল্প কাকে বলে, সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, 'আমার মতে ছোটগল্প প্রথমে গল্প হওয়া চাই, তারপরে ছোট হওয়া চাই, এ ছাড়া আর কিছুই হওয়া চাই না।' এই অসাধারণ বক্তব্যের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ছোটগল্পের আসল চরিত্র। মানুষ শেষ পর্যন্ত গল্প বলতে গল্পই বোঝে। তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যত ইচ্ছে হোক, কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত গল্প হয়ে উঠতেই হবে। মানুষ আজও গল্প ভালোবাসে। গল্পকারের হাত ধরে অনাবিষ্কৃত ভূ-খণ্ডে ভ্রমণের নেশা পাঠককে আজকের এই দ্রুততার মাঝেও গল্পমুখী করে রেখেছে। বিশেষত ছুটির অবসরে গল্পের পাতা ওলটানো—তার আকর্ষণই আলাদা। রবির পাঠকদের জন্য তাই এবার রইল গল্পের ভুবন-এর খোঁজ।

গল্পগুচ্ছ

সাদা দেওয়াল, কালো বেড়াল
তৃষ্ণা বসাক ৪

প্রচ্ছন্নে যখন
কমলেশ রায় ৮

প্রতারক
অর্ণব সাহা ১৬

ধূসরনীল সবুজ
নন্দিতা আচার্য চক্রবর্তী ২৩

নিয়মিত বিভাগ

উদাসী বাবার আখড়া ২৯
শীত হলুদের কাশ্মীর
ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়
আরব্য রজনী ৩২
শেষ পাতে ৩৪
সুব্রত সেন

সম্পাদক **পূষন গুপ্ত** ▮ সহযোগী সম্পাদক **সুব্রত সেন**

পূষন গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদকীয় দফতর: সার্কুলার কোর্ট, ষষ্ঠ তল, ৮ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৭।

সাদা দেওয়াল, কালো বেড়াল

তৃষ্ণা বসাক

সে যেন অনেক কষ্ট করে ঘাড় বেঁকিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। রাস্তাটা তার দেখার পক্ষে খুব দীর্ঘ নয়, সামান্য এগিয়েই হলুদ বাড়িটায় ধাক্কা খেয়ে বাঁদিকে বেঁকে গেছে। সেই বাঁকের মোড়ে দু'পাশে দুটো পলাশ গাছ, একটা বেঁটে, একটা লম্বা। কোনওটাতেই পাতা নেই, শুধু ফুল। আর সে ফুল, পলাশ বলেই, তার রং বোঝানো যায় না।

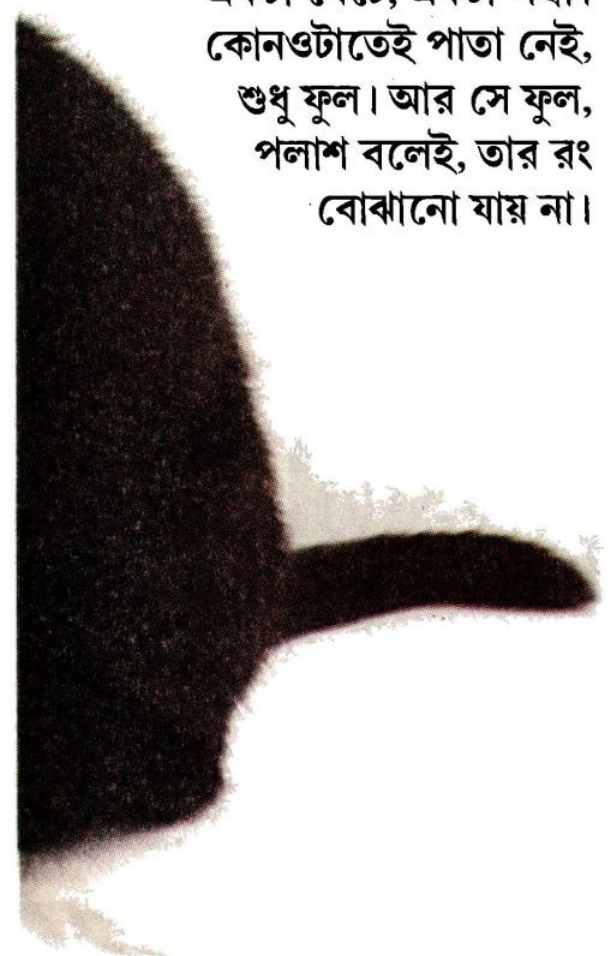

রং বোঝার তার দরকারও নেই, তার ন'টা জীবনেও নেই। সে গন্ধ চেনে। মানুষের গন্ধও। পলাশ গাছদুটোর তলা দিয়ে একটা রিকশা আসছে। সে রিকশায় একজন মানুষ, যার গায়ের গন্ধ সে চেনে। অমনি তার পাঁচিলে এতক্ষণ অলস বসে থাকার ভঙ্গিটা বদলে গেল। সে একটা তীক্ষ্ণ ঝাঁপ দিল রাস্তায়, তারপর আবার তার মধ্যে আগের স্থিতি ফিরে এল যেন। সে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল আলসেভাবে। তারপর মাধবীলতায় ঢাকা গেটে পিঠ ঠেকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল রিকশাটা কতক্ষণে থামে।

দেবারতি যখন রিকশার ভাড়া মেটাচ্ছেন, সে তার শাড়ির কুঁচিতে মুখ ঘষছে। ঘণ্টা চারেক জার্নির ক্লান্তিকে টপকে দেবারতির মুখে হাসি ফুটে উঠল। কাঁধে ভারী স্যামসোনাইট আর চটের ঝোলা ব্যাগ নিয়েই ঝুঁকে পড়ে মিলির কালো রেশমী গা ছুঁয়ে তিনি বললেন, 'সবার খাওয়া হয়ে গেছে? ভালো ছিলিস তো সবাই এই সপ্তাহটা?'

সবাইয়ের একজন তখন খেয়ে উঠে টেবিল মুছে, মৌরি চিবোতে চিবোতে বারান্দায় বেরিয়ে দেবারতিকে দেখতে পেলেন। অমনি তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। সুকান্ত, তাঁর দু' বছরের অবসর জীবনের সময়বোধ থেকে বললেন, 'লাস্ট মিসড কলটা রবীন্দ্রসদন থেকে দিয়েছিলে না? মেট্রোতে এতক্ষণ লাগল?' 'সুইসাইড'। ব্যাগ বারান্দায় নামিয়ে চটির র‍্যাকে চটি রেখে বললেন দেবারতি।

সুকান্ত মৌরি চিবোতে চিবোতে ভাবলেন—'আত্মহত্যার সেরা ঠিকানা এখন মেট্রো'—কপি হিসেবে জব্বর হবে না? সঙ্গে মানানসই ছবি—মেট্রোর জনশূন্য প্ল্যাটফর্মে একটা মোবাইল আর একজোড়া স্টিলেটো। এসব পেছনে ফেলে থার্ড রেলে ঝাঁপ মেরেছে তরুণী। সুকান্ত কেমন চমকে উঠে বললেন, 'কে সুইসাইড করল? ছেলে না মেয়ে?'

ওঃ! যতসব ফালতু প্রশ্ন। রিটায়ারমেন্টের পর বাড়ি বসে বসে মাথাটা গেছে। দেবারতি প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করলেন, 'পাবলো আজকাল কখন ফিরছে?'

'সাতটার মধ্যেই তো চলে আসে।'

আগে ছেলেটা ন'টার আগে ফিরত না। এ বছর ওর থিসিস জমা দেবার প্ল্যান ছিল। বারান্দা পেরিয়ে ডাইনিং স্পেসে ঢুকতে গিয়ে থমকে যান দেবারতি। টেবিলে তার ভাত, তরকারি প্লাস্টিকের ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে রেখেছেন সুকান্ত। গ্লাসে জল বাড়া। এমনকী কাসুন্দির বোতলও ফ্রিজ থেকে বার করে টেবিলে রাখা। আজ কলমি শাক হয়েছে তো। রান্নার মোটামুটি একটা গাইডলাইন রোজই রমলাকে ফোনে ফোনে দিয়ে দেন দেবারতি। আজও দিয়েছেন। রমলা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কলমি শাক। রসুন দিয়ে করি?'

'না, না, দাদা রসুনের গন্ধই সহ্য করতে পারে না। কেন, কালো জিরে, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দাও। একটু পোস্ত ছিটিয়ে দিতে পার।'

কাসুন্দি দিয়ে দেবারতি শাক ভালো খান বলে, কাসুন্দির বোতল বার করে রেখেছেন সুকান্ত। কত কাজ শিখে নিয়েছেন এই ন'মাসে, দেবারতি হলদিয়ায় চলে যাওয়ার পর থেকে। শুধু এই শেখাটা বছর পঁচিশ আগে হলে...

দেবারতি যখন রিকশার ভাড়া মেটাচ্ছেন, সে তার শাড়ির কুঁচিতে মুখ ঘষছে। ঘণ্টা চারেক জার্নির ক্লান্তিকে টপকে দেবারতির মুখে হাসি ফুটে উঠল। কাঁধে ভারী স্যামসোনাইট আর চটের ঝোলা ব্যাগ নিয়েই ঝুঁকে পড়ে মিলির কালো রেশমী গা ছুঁয়ে তিনি বললেন, 'সবার খাওয়া হয়ে গেছে?

বয়স পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিতৃতন্ত্রের ভূত সুকান্তর কাঁধ থেকে ধীর ধীরে নেমে যাচ্ছিল, পাবলোও সাবলম্বী হয়ে উঠছিল। তবুও, তখন সুযোগ পেলেও দূরে যাননি দেবারতি। এত পরে গেলেন। যখন হয়তো তাঁর এখানে থাকাই বেশি দরকার ছিল।

শাওয়ারের নীচে দাঁড়াতেই মাঝখানের বছরগুলো সাবানের ফেনার মতো ধুয়ে বাথরুমের মেঝে দিয়ে গড়িয়ে কোন অনির্দেশের দিকে চলে যায়। বিয়ের পর চাকরিটা অনেক লড়াই করে ধরে রেখেছিলেন দেবারতি। পাবলো হওয়ার পর একেবারেই পারা গেল না। পাবলোকে নার্সারিতে ভর্তি করার পর দুপুরে হাতে ঘণ্টা চারেক সময়। ওকে স্কুলে ঢুকিয়ে সায়েন্স কলেজে চলে যেতেন দৌড়ে দৌড়ে। রিসার্চে কাজ শুরু করলেন। একটানা কাজ করতে পারেননি। পাবলোর স্কুলে থাকার সময়টুকুই বেল বরাদ্দ ছিল। অনেক বছর লেগে গেল শেষ করতে। তারপর কলেজের চাকরি। ততদিনে পাবলো এইটে উঠে গেছে। রান্না সেরে, ওদের টিফিন গুছিয়ে ব্যাগে ভরে টেবিলে ভাত-তরকারি ঢেকে রেখে যেতেন। সকালের প্রথম গ্লাস জল থেকে রাতে শোয়ার আগের দুধের গ্লাস—সবই সুকান্ত বিছানায় বসে পেয়ে এসেছেন।

কাসুন্দির স্বাদ জিভে নিয়ে ঘরে এসে দেবারতি দেখেন সুকান্ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। পাপোশে শরীর ছড়িয়ে মিলিও ঘুমোচ্ছে। লাল পাপোশে ওর কালো রেশমী গা গোটা ঘরটাকে একটা উজ্জ্বলতা দিচ্ছে, যা দুপুরকে মানায় না? অবশ্য দুপুর আর কোথায়! সাড়ে তিনটে বেজে গেছে নির্ঘাত। পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করে ও সময়কে আটকে রাখা যায় না। মানুষকেও। সুকান্তর পাশে শুয়ে কী মনে হতে, ওর নাকের তলায় হাত রেখে দেখলেন দেবারতি। বহুকালের অভ্যেস। পাবলো যতদিন তাঁর কাছে শুত, ততদিন প্রায়ই মাঝরাতে উঠে তার গরম নিঃশ্বাস অনুভব করে তবে আবার ঘুমোতে পারতেন নিশ্চিন্তে। ক্লাস সেভেন থেকে পাবলোর আলাদা শোবার ব্যবস্থা হল, সুকান্ত আবার ফিরে এলেন তাঁদের যৌথ বিছানায়। তবু সুকান্তর নিঃশ্বাস অনুভব করার তাগিদ কখনও অনুভব করেননি দেবারতি। আজ হঠাৎ! তবে কি, অবসর নেওয়ার পর দ্বিতীয় শৈশব শুরু হয়ে গেল সুকান্তর? নাকি তিনি আজকাল দূরে থাকেন বলে, আরও কোনও নিঃসীম দূরত্বের ভয় পান দেবারতি?

বয়স পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিতৃতন্ত্রের ভূত সুকান্তর কাঁধ থেকে ধীর ধীরে নেমে যাচ্ছিল, পাবলোও সাবলম্বী হয়ে উঠছিল। তবুও, তখন সুযোগ পেলেও দূরে যাননি দেবারতি। এত পরে গেলেন। যখন হয়তো তাঁর এখানে থাকাই বেশি দরকার ছিল। পাবলো তো এখনো গুছিয়ে নিতে পারেনি নিজেকে। রিমি ওকে সম্পূর্ণ এলোমেলো করে চলে গেছে।

সুনামির পরের বছর সাউথ ইন্ডিয়া টুরে গেছিলেন সবাই মিলে। ঘুরতে ঘুরতে মহাবলীপুরমে এলেন। তামিলনাড়ু টুরিজমের হোটেলে বুকিং ছিল। সমুদ্রের ধারে কয়েক একর জায়গা নিয়ে সেই হোটেল। তার গোটা চত্বর জুড়ে ভাঙা ঘাট, আয়না, টেবিল-চেয়ারের ধ্বংসস্তূপ। সুনামি গোটা হোটেলটাকে তছনছ করে দিয়ে গেছে। মাত্র ছ'টি ঘর ব্যবহারযোগ্য করে রাখা হয়েছে পর্যটকদের জন্যে। সে রাতে আবার তাঁরা ছাড়া আর একটিমাত্র ঘরেই লোক ছিল। সারা রাত বৃষ্টি পড়ছিল। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, উথাল সমুদ্র। প্রায় পরিত্যক্ত সেই হোটেলে গা ছমছমে সেই রাতের কথা ভাবলে আজও শিউরে ওঠেন দেবারতি। পাবলোকে দেখে তাঁর সেই হোটেল ক্যাম্পাস, ভাঙা খাটের পায়া, কাঁচের টুকরো, ছেঁড়া বালিশের কথা মনে পড়ে যায়। এখনও, রিমি চলে যাবার বছর খানেক পরেও। তিনি কি এ সময়টা পাবলোর পাশে থাকতে পারতেন না? খানিকক্ষণ ছটফট করে উঠে পড়েন দেবারতি। সাবধানে দরজা ভেজিয়ে বাইরে আসেন। মশার ভয়ে সব দরজা-জানলা বন্ধ। ডাইনিং স্পেসের অন্ধকারে প্রথমে তিনি কিছু দেখতে পান না। তারপর, আন্দাজে হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় আসেন। দোতলা পাবলোর বেডরুম, স্টাডি আর বড় হলঘর। কড়া ফিনাইলের গন্ধে হঠাৎ তাঁর বমি পেয়ে যায়। কাজের লোকদের মাপ করে না দিলে ওরা এক বালতি জলে এক বোতল ফিনাইলই ঢেলে দেয়। সুকান্তকে বলে যেতে হবে মেপে দিতে। গন্ধটা হসপিটালের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। রিমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, তবু রিমিকে মনে পড়ল কেন? তাকে যেখানে রাখা হয়েছিল, সেটাকে ফাইভস্টার হোটেল বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাকে সারিয়ে তোলার জন্যে কোনও কার্পণ্য করেননি তাঁরা। রিমির বাবা-মাকে এক পয়সা খরচ করতে দেওয়া হয়নি। তবু সে থাকল না। ব্রেন ক্যানসার ওই স্টেজে ধরা পড়লে

কেউ থাকে না। পাবলোর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। খুলে চমকে উঠলেন দেবারতি। পাবলো বিছানায় শুয়ে শূন্য চোখে দেওয়ালের দিকে চেয়ে আছে। কখন এল? নাকি বেরোয়নি আদৌ?

'কখন ফিরলি? জানতে পারিনি তো।'

'আমার কাছে তো ডুপ্লিকেট চাবি থাকে।'

'কিছু খাবি তো?' পুরোনো দিনের মতো উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন দেবারতি। তিনি এসে বাড়া ভাত খেয়েছেন, আর ছেলেটা হয়তো খিদে চেপে শুয়ে আছে—এ কথা মনে করে কুঁকড়ে যান তিনি। তাঁর মনে পড়ে, তিনি তখনও চাকরিতে ঢোকেননি, গরমের বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে জল দেওয়া ভাত আর অনেক পেঁয়াজ দিয়ে ভাজা ওমলেট খেতে ভালোবাসত পাবলো। বিকেলে ওর এই ভাত খাওয়া নিয়ে কত রাগ করেছেন সুকান্ত।

'কী খাবি? প্রেশারে সেদ্ধ ভাত করে দেব? ভালো নুনিয়া আতপ আছে।'

'কিছু খাব না মা, একজন রিসার্চ স্কলারের বার্থডে ছিল, পিৎজা খাইয়েছে।'

'কে, আমি চিনি?'

'দেখেছ। আমাদের বিয়েতে এসেছিল, শ্রীতমা। মনে নেই হয়তো।'

দেবারতি কেন জানি আঁতিপাতি করে খুঁজতে থাকেন মুখটা। অত উজ্জ্বল সন্ধ্যায় কাউকে আলাদা করে চিনে রাখা সহজ নয়। হঠাৎ সোল্লাসে বলে ওঠেন, 'শ্রীতমা! সেই যে মেয়েটা মোবাইল ফেলে গেছিল?'

'মনে আছে তোমার? এত ভুলো মন মেয়েটার, সবসময় কিছু না কিছু হারাচ্ছে।' পাবলো যেন মিলির গায়ে হাত বোলাচ্ছে এমন স্বর ওর গলায়।

দেবারতি বলেন, ভালোই খসালি তোরা ওর। ক'জনে খেলি? পিৎজার যা দাম! আমরা তো এক প্লেট পকোড়া সাত-আটজনে ভাগ করে খেতাম।'

'আর কেউ নয়, শুধু আমি।'

'শুধু আমি' শব্দ দুটো যেন হাত থেকে ছেড়ে যাওয়া রঙিন গ্যাস বেলুনের মতো ভেসে রইল হাওয়ায়। সুতোটা এত দূরে, দেবারতি টেনে নামাতে পারলেন না। তিনি দেওয়ালের দিকে তাকালেন। ছবিগুলো কোথায় গেল? ওদের বিয়ের ছবি, হনিমুনের ছবি? পাবলো ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল, 'খুলে ফেলেছি। সাদা দেওয়ালই ভালো।'

সাদা দেওয়াল! দুটো মাত্র শব্দেরও এত শূন্যতা থাকে? দেবারতি বলেন, 'তাহলে কিছুই খাবি না, চা খা অন্তত।'

পাবলো উঠে বসে। 'তুমি একটুও রিল্যাক্স করতে পারো না, না মা? সারাক্ষণ কাজ খুঁজে বেড়াও। আচ্ছা, মাথার মধ্যে সারাক্ষণ এটার পর ওটা, তারপর সেটা সাজিয়ে রাখলে ভার ভার লাগে না, কষ্ট হয় না তোমার?'

কষ্ট! এই তো করে গেলেন সারা জীবন! রান্না, তারপর বাটিতে বাটিতে ঢালা, গ্লাসে জল, নুনদানিতে নুন, টিফিন বক্স, ওয়াটার বটল, স্কুল বাস, নিজের ক্লাস, আবার স্কুলবাস, আবার রান্না, আবার বাটিতে বাটিতে ডাল, মাছ, গ্লাসে জল।

মাথাটা ছিঁড়ে পড়তে চাইছে আজকে ভাবতে গিয়ে। তবু ওই জীবনটাই তো উনি বেঁচে এলেন এতদিন!

পাবলো আবার বলে, 'ওখানে কী করো মা? এত কাজ পাও খুঁজে?'

'কাজ নেই আবার? তবে এখানকার মতো নয়, যেন খেলা-খেলা কাজ। আর বেশি সময় পাওয়া তো ভালো নয়। রাজ্যের চিন্তা মাথায় চেপে বসে। তোর বাবার চিন্তা, তোর চিন্তা। তবে,' জোর করে হাসি এনে দেবারতি বলেন, 'এবার একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরব বুঝলি। তুই আস্তে আস্তে মেনস্ট্রিমে ফিরে আসছিস। তবে ছবিগুলো এক্ষুনি না সরালে পারতিস।' পাবলো কতক্ষণ তাঁর দিকে স্মিতমুখে চেয়ে থাকে, তারপর আচমকা বলে, 'মা পিৎজাটা খুব ভালো ছিল, ব্যস ওইটুকুই।' দেবারতি চশমার কাচ মুছে নেন একবার। পাবলো এবার আরও স্পষ্টভাবে বলে, 'মা, শ্রীতমার একজন স্টেডি বয়ফ্রেন্ড আছে, আর আপাতত আমি।'

'তুই আপাতত?' দেবারতির গলায় টেনশন।

'আমি আপাতত একটা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে জার্মানি যাচ্ছি দু' বছরের জন্যে।'

'জার্মানি, মানে এখানে তোর বাবা, একেবারে একা!'

'মা, সারাদিনে বাবার সঙ্গে ক'টা কথা হয় বলো তো আমার? তুমি হলদিয়ায় চলে যাবার পর থেকে আমরা দুটো অজানা গ্রহের বাসিন্দা হয়ে গেছি। বাড়িতে আমার নিজের বলতে ওই মিলি। আর রিমির ছবিগুলো। আমার এখানে দম বন্ধ হয়ে আসছে মা।'

দেবারতির না থাকাটা কি এত বড় ইস্যু, নাকি ওরা বাপ-ছেলে, জন্ম অচেনা দুটো প্রাণী, পৃথিবীর আদিম শত্রু?

তিনি তবু অপরাধী গলায় পাবলোর পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, 'আমি না গেলেই ভালো হত, না রে?'

তাঁর চোখ ছলছল করে, তবুও সেই ছলছলে চোখের তলায় সুখী বেড়ালের মতো তাঁর মন আরাম পোহায়। আর সাদা দেওয়ালের দিকে চেয়ে চেয়ে পরম সন্তোষে ল্যাজ নাড়ে। ❖

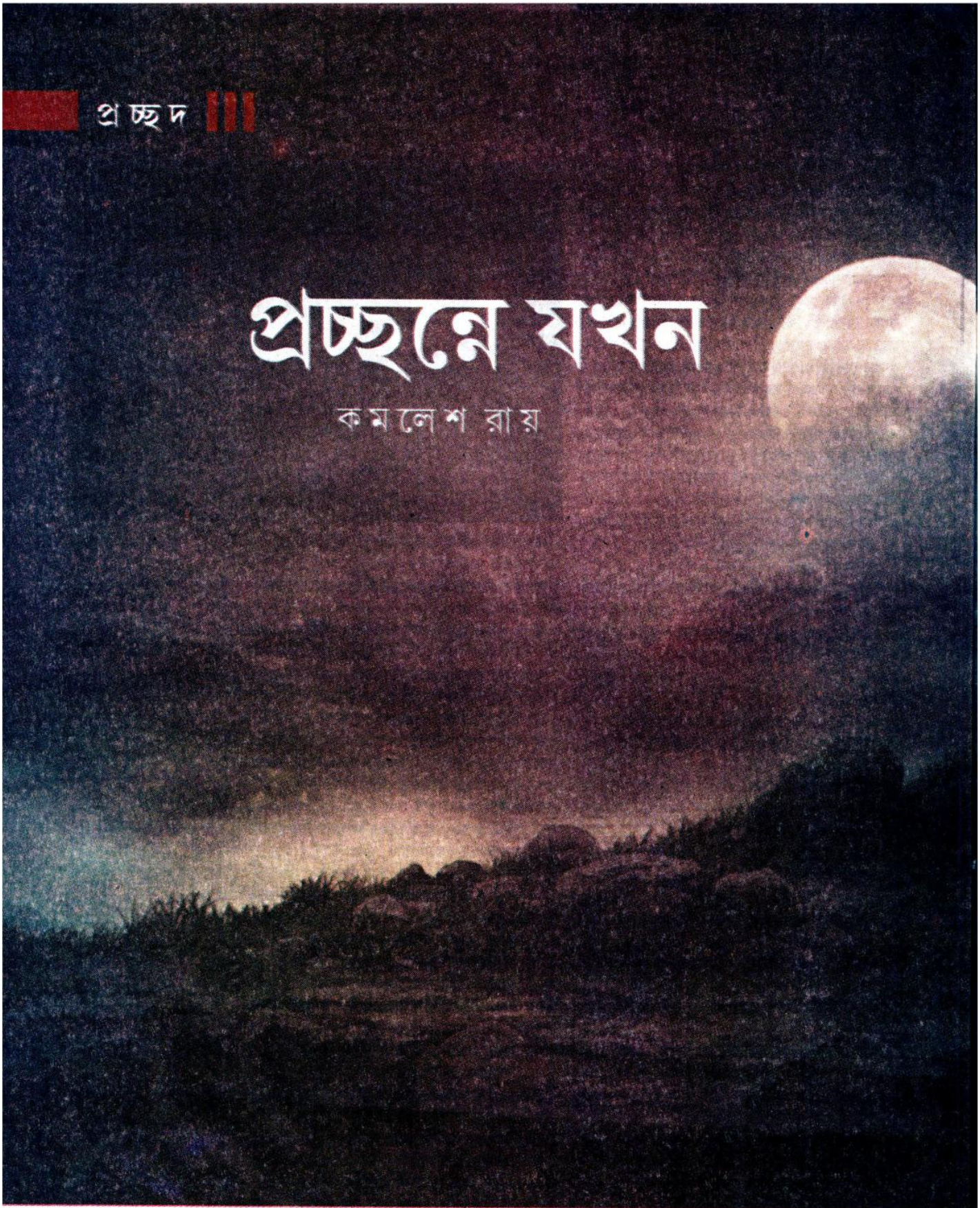

প্রচ্ছন্নে যখন

কমলেশ রায়

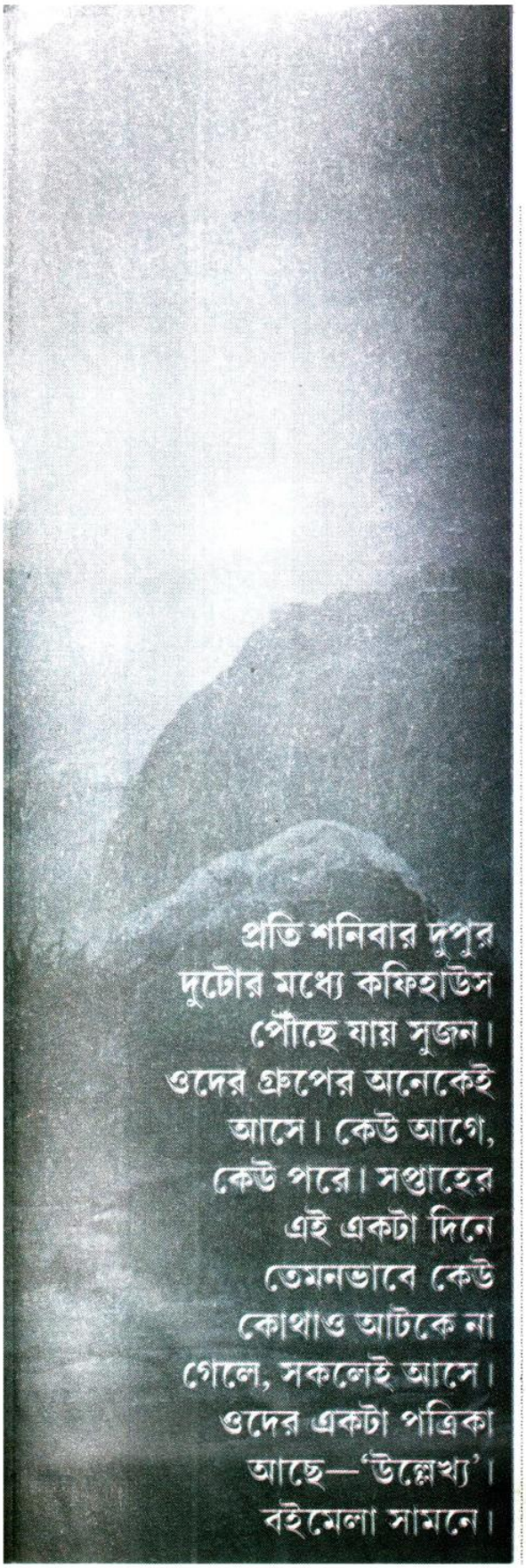

প্রতি শনিবার দুপুর দুটোর মধ্যে কফিহাউস পৌঁছে যায় সুজন। ওদের গ্রুপের অনেকেই আসে। কেউ আগে, কেউ পরে। সপ্তাহের এই একটা দিনে তেমনভাবে কেউ কোথাও আটকে না গেলে, সকলেই আসে। ওদের একটা পত্রিকা আছে—'উল্লেখ্য'। বইমেলা সামনে।

অনেকেরই লেখা জমা দেওয়ার কথা আছে আজ। সুজনও দেবে, গল্প।

গলি থেকে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় বঙ্কুর পান সিগারেটের দোকান। সবুজ রং করা ছোট কাঠের ঘেরা। মাঝখানে সাদা পাথরের স্ল্যাব, নানা মশলার কৌটো সাজানো, বাংলা-মকাই-বেনারস সব পাতাই পাওয়া যায়। পাঁচ-ছ' রকমের জর্দা, পান পরাগ। সব সময় একটা মিষ্টি গন্ধ উঠছে দোকান থেকে। নিচু আওয়াজে এফ-এম রেডিও চলে সারাদিন। দোকান ঘিরে পান বিলাসীদের দুবেলাই বেশ ভিড়।

সুজন বাস ধরার আগে এখানে দাঁড়ায়। একটা ফ্লেক আর দড়ির আগুন। এর একটা আলাদা স্বাদ আছে, সুজন তার পঁয়ত্রিশেও কাটিয়ে উঠতে পারল না। মাঝে একবার বঙ্কু দড়ির আগুন তুলে দিয়ে মাচিস রেখেছিল। দিনে তিনটে মাচিস শেষ হতে আবার দড়ির আগুনে ফিরে এসেছে।

বঙ্কুর দোকান থেকে ক'হাত তফাতে একটা ছাতিম গাছ। খানিকটা ঝাঁকড়া বলে ছায়াটা, হাওয়ায় পাতার শব্দটা আজও পাওয়া যায়। ব্যাপারটা কেমন যেন অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে—দড়ির আগুনে ফ্লেক ধরানো, শেষ টান পর্যন্ত ছাতিমের নীচে দাঁড়ানো। তারপর বাস ধরা। আজ গাছটার দিকে এগোতে গিয়ে মাথাটা ঝাঁ করে টলে গেল।

আবার সেই পুরোনো ঝিম ঝিম ভাব। মাথার দুপাশে অসহ্য যন্ত্রণা। চোখে চশমা, কিন্তু কাচের ওপারে সব যেন ঝাপসা হয়ে এল। লোকজন ভিড়, বাড়িঘর, ফুটপাথ, বাস, ট্যাক্সি। এপারে বঙ্কুর দোকান, দোকানের পাশে গলি। থরথর করে শরীর দুলে উঠল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। খড়কুটো ধরার মতো ধরতে গিয়ে দেখল, আশেপাশে কেউ নেই, কাকে ধরবে সে? পড়েই যাচ্ছিল ফুটপাথে, মনে হল, কে যেন ধরে ফেলল।

'কী হল সুজনদা, শরীর খারাপ লাগছে? বাড়িতে পৌঁছে দেব?'

'না-না। ওই ছাতিম গাছটার নীচে দাঁড় করিয়ে দাও।'

সুজন ছেলেটাকে আবছা চিনতে পারল, ঝাপসা-ঝাপসা। ওদের পাড়ায় দেবু, দেবব্রত। কয়েক শিফটে টিউশনি করে। ওর পাঁচ বছরের মেয়েকে পড়ায়—অঙ্ক। দেবু জানে, পাড়ার সকলেই জানে সুজনের একটা অসুখ আছে। ডিমেনশিয়া। মাঝে মাঝে নাম ভুলে যায়, ঘরবাড়ি ভুলে যায়। এই অবস্থার পরে আবার স্বাভাবিকে ফিরে আসতে দু-তিন মাসও লেগে যেতে পারে।

দেবুর কী একটা কাজ ছিল ঢাকুরিয়ার দিকে। ছাতিমতলায় সুজনকে দাঁড় করিয়ে চলে গেল।

সুজনের হাতে দড়ির আগুনে জ্বলছে ফ্লেক। পুড়ছে, তাপ লাগছে। তামাকের গন্ধ, নীলচে ধোঁয়া। পরনে সাদা লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি, পাজামা। পাঞ্জাবির বুকের দু দিকে খয়েরি প্রিন্ট। কাঁধে কাপড়ের ঝোলা। ঝোলাটা একবার দেখল সে। ভাঁজ করা কাগজ, চেনওয়ালা ছোট ব্যাগে কিছু টাকাপয়সা। মোবাইলটা নেই। মনে করতে গিয়ে দেখল, মোবাইল তার আদৌ ছিল কি না, সেটাই সে জানে না।

সুজন ছেলেটাকে আবছা চিনতে পারল, ঝাপসা-ঝাপসা। ওদের পাড়ায় দেবু, দেবব্রত। কয়েক শিফটে টিউশনি করে। ওর পাঁচ বছরের মেয়েকে পড়ায়—অঙ্ক। দেবু জানে, পাড়ার সকলেই জানে সুজনের একটা অসুখ আছে। ডিমেনশিয়া।

প্ল্যাটফর্মে সিমেন্টের বেঞ্চ রংচটা। একদিন রঙের পোঁচ পড়েছিল, ঝড় জল বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। ছোট ছোট নুড়ির দানা ফেলা, জুতোর শব্দ উঠছে। এই শব্দে সুজনের মনে হল, সে চেনা জায়গায় ফিরে এসেছে।

আর সেই মুহূর্তে, দুপুরের হাওয়ায় যখন ছাতিমের কয়েকটা পাতা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে পড়ল, বাসের কন্ডাক্টর ডাক দিতে দিতে চলে গেল বিভিন্ন গন্তব্যে, এই শহরের কথা পুরোপুরি ভুলে গেল সুজন। সে এক অচেনা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কবে এল, কোথা থেকে এল, কিছুই মনে পড়ছে না। একটানা কুয়াশায় সে ও শহর, দু'জনেই ঝাপসা।

কোনও দিন কি তার এই অচেনা শহরে বসবাস ছিল, কী ছিল তার নাম? কোন গভীরে চলে যাচ্ছে সে, গভীর থেকে গভীরতর। চোখের সামনে আঁধারের স্ক্রিন ঝড়ের মতো দুলছে। তার শরীর জুড়ে কার যেন প্রাণখোলা হাসি। মাথার ভেতরটা ভীষণ, ভীষণ শূন্য। ইচ্ছে করলে সে এখন কোথাও উড়ে যেতে পারে, এই পৃথিবী, তার উষ্ণতা, সবকিছু ফেলে রেখে। সে তো এই শহরের লোকই নয়, বেদুইনের মতো মরুভূমি পার হয়ে এসেছে, আবার ফিরে যেতে হবে।

একটা বাস এসে দাঁড়াতে উঠে পড়ল সে। বাসটা যখন একটা বড়, সাদা পুল পেরোচ্ছিল, দেখল, তার নীচে চওড়া নদী। লঞ্চ, ছোট স্টিমার, নৌকো। কোনও বন্দর নাকি? হবে হয়তো। পুল পেরিয়ে বাসটা দাঁড়াতে হুড়মুড় করে যাত্রীরা নেমে গেল। সুজনও নামল। সামনে লাল রঙের বড় বাড়ির স্টেশন। সকলে ছুটছে, সুজনও ওদের পিছু নিল। উঠে পড়ল একটা ট্রেনে।

বিকেলের মুখে ট্রেনটা একাটা ছোট স্টেশনে দাঁড়াল। কুসুমতলা। নাম দেখেই সুজন চিনতে পারল, এ তো তার কবেকার চেনা স্টেশন! অনেক দিন সে এখানে ছিল।

লালচে ছোট নুড়ির প্ল্যাটফর্ম। স্টেশনের বাইরে ঝুপসি গাছে গাছে বিকেলের আলো হোলি খেলছে। তবে একটাই রং, ফিরে গোলাপি। এদিকে সূর্য ডুবলে এ রকম রং ছড়িয়ে যায় মাঠেঘাটে। কিছু লোকজন নেমেছে। সুজন ঝোলা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে নেমে পড়তেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল, যেন সে নামবে বলেই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল।

প্ল্যাটফর্মে সিমেন্টের বেঞ্চ রংচটা। একদিন রঙের পোঁচ পড়েছিল, ঝড় জল বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। ছোট ছোট নুড়ির দানা ফেলা; জুতোর শব্দ উঠছে। এই শব্দে সুজনের মনে হল, সে চেনা জায়গায় ফিরে এসেছে। অনেক দিন থেকেই এই জায়গাটার খোঁজ করছিল। মাঝে মাঝে স্বপ্নে আবছা দেখা। আজ খোঁজ পেয়েছে। এখানেই তো তার আসল ঘরবাড়ি ছিল!

ওই তো স্টেশন চৌহদ্দির বাইরে কবেকার সেই ঝাঁকড়া মাদার গাছ, লাল ফুল ফুটেছে। ওর পেছনে শানবাঁধানো গোল বড় কুয়ো আছে। চারকোনায় ঘুর্ণি, কেউ না কেউ জল তুলছে। এখান থেকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না, তবু জানে কুয়োর দুখো খুড়োর সাইকেল মোরামতির দোকান। বাতিল টিউব কেটে সলিউশন সেঁটে পাংচার, নল লাগানো পাম্পে টায়ারে হাওয়া দেওয়া। তারও ওপাশে পদ্মমাসির ফুলুরি চপ মুড়ির দোকান। দোকানের পাশে টিউকল। রেলকলোনির ওদিকের বস্তির মেয়েরা ভিড় করে। কলসির লাইন, একটা কলসি এদিক-ওদিক হলে কাঁচা গালাগাল।

এসব দৃশ্য বড় চেনা। কতদিন পরে যে সুজন নিজের গাঁয়ে ফিরল! রেলগেটের বাইরে এসে দেখল, আগের গাঁ নেই। খানিকটা শহুরে ছোঁয়া লেগেছে। কিছু নতুন বাড়িঘর, আগে ছিল না। তবে সাইকেল মেরামতির দোকান, পদ্মমাসির চপ ফুলুরির দোকান যেমনকে তেমন আছে।

সেই কুয়ো, সেই মাদার গাছ! মাদার গাছের নীচে রিকশাস্ট্যান্ড। চেনাজানা কেউ চোখে পড়ছে না, হতেই পারে, কত বছর পরে সে ফিরছে! অনেকেই ভুলে গেছে তাকে। আজকাল তো জায়গা বছরে বছরে বদলে যায়। কুসুমতলা বদলাবে এতে আর আশ্চর্য কী!

পদ্মমাসির দোকানে বসল সুজন। সেই বাঁশবাখারির বেঞ্চ, পাশাপাশি দুটো। পদ্মমাসির শরীর ভেঙেছে। যৌবন টসকেছে। সুজন আগে দেখেছে, পদ্মমাসির যৌবনের ফুলটি দেখার জন্যে কত লোক বেঞ্চে বসে হাতে ভাঁড়ের চা নিয়ে, চা ও পদ্মমাসির দারুণ স্বাদ নিত। ফাঁকে পেলে আলটপকা কথা, দেহাতি বাউলের রাধাকৃষ্ণর মিলন, রাধার বিরহ, এসব শুনিয়ে দিত। পদ্মমাসির ঠোঁটে তখন চাপা হাসি।

সুজন এক ভাঁড় চায়ের কথা বলল। চোখ উঠিয়ে দেখল পদ্মমাসি, বসা চোখ, চোখের নীচে কালি, আঁচের আগুনে দুবেলা চপ ভাজতে ভাজতে চোখের আলো খুইয়ে ফেলেছে। ভীষণ ক্লান্ত চোখ দুটো, ভাঙা সংসার ছড়িয়ে গেলে যেমন হয়।

আহা, আগে কী রূপ ছিল সে চোখের! ঠিক যেন একজোড়া পদ্ম পাপড়ি পাশাপাশি। চোখে মোটা করে কাজল। পদ্মমাসি বৈষ্ণবী নয়, তবে কপালে আর নাকে রসকলি আঁকত, শুধু ওইটুকুতেই তার দোকানে সকাল-বিকেল লাইন পড়ে যেত। কারও দিকে চোখ তুলে একটু হাসলে, দিনটা শীতকাল হলেও সে ভাবত, রেললাইনের ওদিকে দূরে কোনও গাছের ফাঁকে চৈতিকোকিল ডাকছে!

পদ্মমাসি সুজনকে চিনতে পারল না। না পারুক, মানুষটা তো বেঁচেবর্তে আছে। এই যে এত বছর পর সুজন নিজেই ফিরে এল, সেও কী আগের মতো আছে নাকি? আগে হাফ-ফতুয়া আর ধুতি পরে দেহাত থেকে দুধের ক্যান আর তাজা সবজি নিয়ে সাইকেলে স্টেশন বাজারে আসত। দুদিকের হ্যান্ডেলে দুটো ক্যান, পেছনে ক্যারিয়ারে থাক করে বাঁধা তিন-চারটে সবজির ঝুড়ি।

এতদিন অন্য একটা শহরে তার চাকরি-বাকরি, বসবাস ছিল। সেই জীবন, সংসার মনের মতো ছিল না, তবু গড়তে হয়েছিল। দমচাপা অবস্থা, বাইরে বেরোতে পারছিল না। কুসুমতলায় ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। যে যাই বলুক বাবা, নিজের গাঁ-ঘরে, দেহাতে ফেরার মতো আরামের জিনিস নেই। ভগবান এমন একখানা কল বানিয়েছে, তুমি যেখানেই থাকো, যাই করো, একদিন তোমাকে এখানেই ফিরে আসতে হবে। জন্মটান বলে কথা! হাসল সুজন।

পদ্মমাসি ভাঁড়ের চা দিল, এত কাছাকাছিতেও তাকে চিনতে পারল না। এখন তার মনে হচ্ছে, বছররা পুরোনো হতে থাকলে মানুষরাও পুরোনো, ঝাপসা হয়ে যায়, আগের মতো চেনা যায় না। কোঁচকানো চোখ, বসা গাল, খোঁপাটা আলগা হাতে বাঁধা। অথচ সুজনের স্পষ্ট মনে আছে, তখন পদ্মামাসি সকালে-বিকেলে খোঁপায় ফুল গুঁজত। সাদা গন্ধরাজ, টগর, করবী, মাঝে মাঝে খোঁপা ভেঙে চুলের ঢল বুকের বাঁ দিকে, কেমন যেন বৈরেগী-বৈরেগী। আর তাতেই লোকজন হায় হায় করে উঠত।

স্টেশনের পয়েন্টসম্যান কালী পাখিরার দিনভর ধাররার পাঁইটি চলত। ছোট স্টেশন, সারাদিনে দু'জোড়া গাড়ির যাওয়া-আসা। বাকি সময় কাটবে কী করে? বিকেলে কালী গাঁজার কলকেতে দম মেরে 'বাবা মহাদেবের সেবা লাগে' বলে পদ্মামাসির দোকানে পৌঁছে যেত। পদ্মমাসির বৈরাগী রূপ দেখে হায়-হায় করে উঠত, 'ও পদ্ম, আর বৈরাগী হস্‌নি, ফিরে আয়, ফিরে আয়। বলিস তো তোকে এখুনি ঘরে তুলব।'

লোকজন হেসে উঠত, 'শালা কালীর আজ ভাব চেগেছে।'

এতদিন অন্য একটা শহরে তার চাকরি-বাকরি, বসবাস ছিল। সেই জীবন, সংসার মনের মতো ছিল না, তবু গড়তে হয়েছিল।

‘আমিও শ্যামল, বন্দ্যোপাধ্যায়। বামুনের ছেলে। দশ ক্লাস পড়েছি। দিনে রিকশা চালাই, সন্ধে ছ’টার পরে রংকলের মাঠে পরিদের এজেন্সি করি। জীবনে গপ্পোটপ্পো লিখিনি। দশ টাকা দিন, টিকিট কাটি। তবে এখন যেতে পারবেন না।’

পদ্মামাসি ফিক করে হেসে উঠত, ‘মরণ।’

সকলে বুঝতে পারত, ওটা পদ্মর গালাগাল নয়, পরানের কথা। কালী পাখিরা যেমন খোলাখুলি পদ্মকে কাছে পাওয়ার বাসনা, আকুলতা জানাত, অন্যরা কেউ তেমনটি পারত না। আসলে তারা জানত না, শুধু গাঁজার নেশা নয়, পদ্মকে নিয়ে তার অন্য এক নেশা ঘুর পাক খেত।

চা খেয়ে উঠতে গিয়ে সুজন বুঝতে পারল, আবার মাথার দুপাশে যন্ত্রণা। একটু দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে এল রিকশাস্ট্যান্ডে।

বিকেল শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঘোর ঘোর ভাব লেগেছে গাছপালায়। মাদার গাছে পাখিদের জটলা। একটু পরেই আঁধার, তারপর সন্ধে। রিকশাওয়ালা চিনতে পারছে না। সে এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে হয়তো কাজে লেগেছে।

‘আসুন বাবু, কোথায় যাবেন?’ রিকশাওয়ালা বলল।

‘ভাবছি কোথায় যাওয়া যায়।’

‘এটা তো ছোট জায়গা, তেমন কিছু দেখার নেই। একটা জায়গা আছে।’

‘কোন জায়গা?’

রিকশাওয়ালা এদিক-ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, ‘পরির মাঠ।’

‘পরির মাঠ! ওখানে পরিরা নামে নাকি?’

‘নামে কী বলছেন বাবু, ঘোরাফেরা করে।’ হাসল রিকশাওয়ালা, ‘চলুন পৌঁছে দিচ্ছি।’

সুজন রিকশায় উঠে পড়ল। একটু আগেও যে জায়গাটা মনে হচ্ছিল পরিচিত, মাথার সেই ভার-ভার যন্ত্রণাবোধ নিয়ে এখন যেন খানিকটা কুয়াশা-কুয়াশা, আধ চেনা। লাল মোরামের রাস্তা। স্টেশনের এলাকা ছাড়াতে দুপাশে ফসলের মাঠ, স্যালোর জলে চাষ। রাস্তার ধারে নিচু ঝোপঝাড়, বাবলা আর আকাশমণি।

একটু পরে মোরাম রাস্তা ছেড়ে অন্য একদিকে বাঁক নিল রিকশাটা। কিছুটা দূরে একটা মাঠের ধারে নামিয়ে দিল, ‘এটাই পরির মাঠ, যান।’ ভাড়া নিয়ে সে চলে গেল।

সুজন কিছুটা এগিয়ে দেখল, সামনেই একটা পুরোনো বড় কারখানার শেড। পরিত্যক্ত ভাঙাচোরা। চারদিকে গাছপালা জড়িয়ে ধরেছে, দেওয়াল শ্যাওলাধরা, সে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ফাঁকে আঁধার নেমে পড়ল। হঠাৎ একজন হাজির, ‘টিকিট নেওয়া আছে?’

‘কিসের টিকিট ভাই?’

সামনে দাঁড়িয়ে পঁচিশ-ছাব্বিশের ছেলে, জামার হাতা অনেকটা গুটিয়ে মাসল বের করা। আর তখনই টুপ করে কাছাকাছি বিজলি বাতির পোলে আলো জ্বলে উঠল। আগে তো কুসুমতলায় বিজলি বাতি ছিল না। কম পাওয়ারের ঘোলাটে আলো। ছেলেটার রুখু চেহারা স্পষ্ট হল। এক কানে দুল, হাতে বালা, বুক খোলা শার্ট, গলায় লকেট-চেন। ছেলেটা ওকে উপর-নীচে দেখল, হাসিটা ওর খুচরো ব্যবসা, আসলটা অন্য কিছু।

‘বুঝতে পেরেছি নতুন এসেছেন। এই যে কারখানাটা দেখছেন, অনেক বছর আগে এটা একটা রংকল ছিল, বন্ধ হয়ে গেছে। এর পেছনে রংকলের মাঠ, ওটাই পরির মাঠ। পরিকে পেতে হলে বুকিং করতে হবে।’

‘সে না হয় করলাম তারপর?’

‘তারপর কি? চাঁদের জোছনায় পরি নামবে, তাকে নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরবেন, ঝোপঝাড়ের আড়ালে মৌজমস্তি করবেন।’

‘কেউ যদি দেখে ফেলে?’

‘তার জন্যে আমি আছি, পাহারাদার। সন্ধের পর রংকলের মাঠটা আমার। সবাই জানে, আমি ওখানে পরি নামাই, কেউ আসবে না।’

‘দাঁড়াও, দাঁড়াও মন পড়ছে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বলে একজন লেখক ছিলেন, তিনি এরকম একটা গল্প লিখেছিলেন। এক আধবুড়ো লোক জোছনারাতে বেহালা বাজিয়ে পরি নামাত।’

‘আমিও শ্যামল, বন্দ্যোপাধ্যায়। বামুনের ছেলে। দশ ক্লাস পড়েছি। দিনে রিকশা চালাই, সন্ধে ছ’টার পরে রংকলের মাঠে পরিদের এজেন্সি করি। জীবনে গপ্পোটপ্পো লিখিনি। দশ টাকা দিন, টিকিট কাটি। তবে এখন যেতে পারবেন না।’

‘কেন?’

‘আপনার আগে আরও তিনজনের লাইন আছে। তারা এসে পড়ল বলে। আপনার পরি এখনও আসেনি। সময় হলে আসবে।’

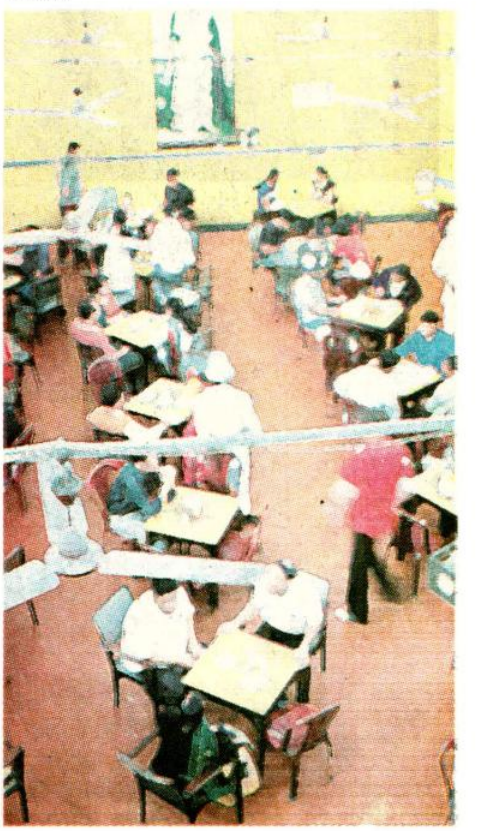

প্র চ্ছ দ

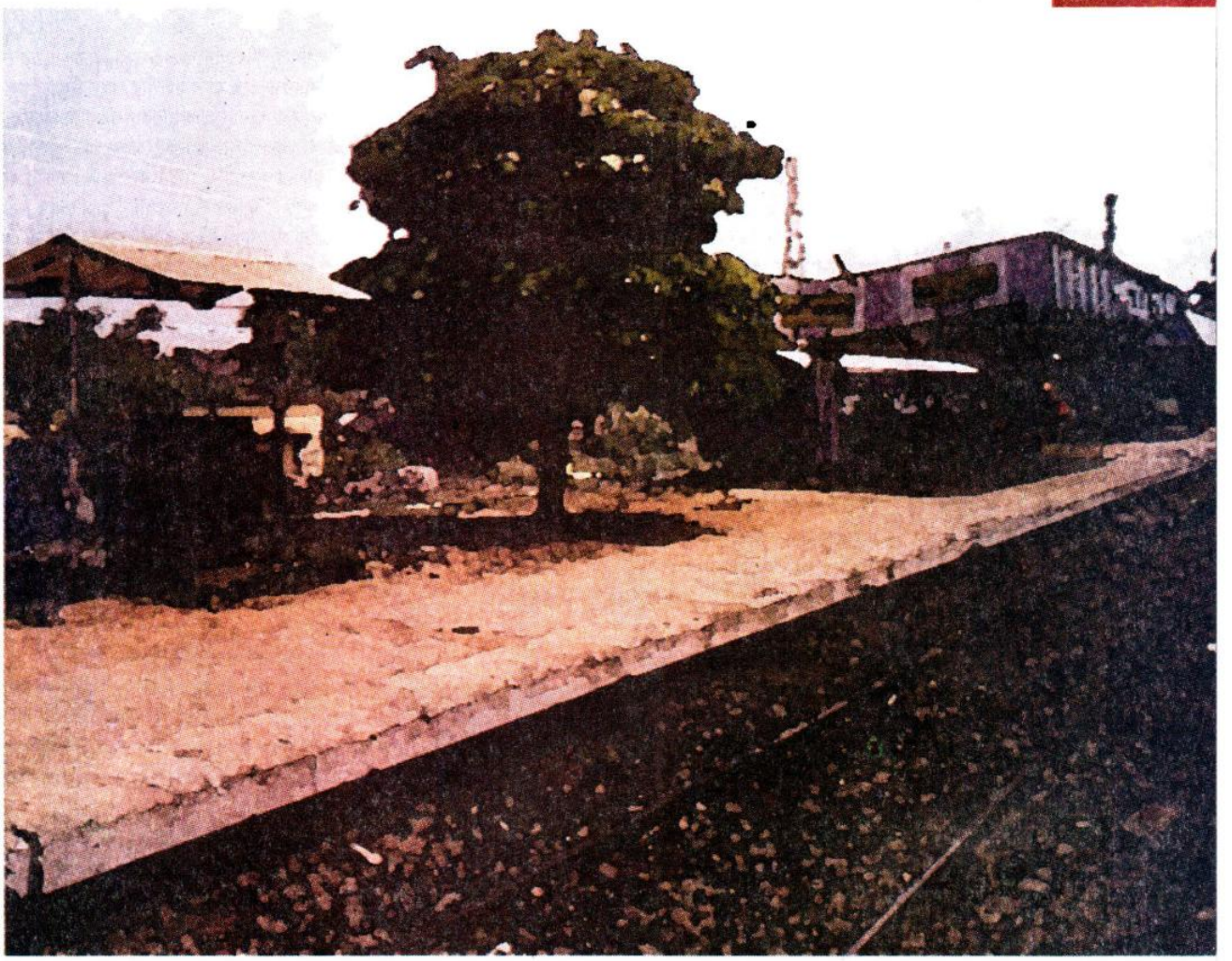

সুজন দশটাকার একটা নোট দিল, 'ততক্ষণ আমি থাকব কোথায়?

'তার বন্দোবস্ত আছে। ওই যে ওদিকে ঝাঁকড়া শিশু গাছ, ওর তলায় বাঁশের বেঞ্চ, ওখানে বসুন। আপনার পরি আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবে। পরির রেট আলাদা। পরির বয়স তিরিশ হলে পঞ্চাশ, কুড়ি থেকে পঁচিশ হলে একশো। আপনার কপালে যা জোটে। তা হলে গাছতলায় বসুন। আমি যে টাকাটা নিলাম, এটা আমার এজেন্সি ফিস।'

ধবধবে সাদা বাতাসার মতো চাঁদের জ্যোৎস্না উঠেছে। সুজনের কপালে যে পরি জুটেছে, এক কথায় অপূর্ব। খুব ফরসা, পঁচিশ, চুল খোলা। মাঠের উল্টোপাল্টা বাতাসে চুলে মুখ ঢেকে যাচ্ছে, হাত তুলে চুল সরিয়ে দিচ্ছে পরি। সামান্য সময়। তাতেই সুজনের পরির বুক, খোলা পেট, কোমরের ভাঁজ, তার নীচে হালকা নীল শাড়ি, সবই দেখা হয়ে গেছে। পরি তার নাম বলেছে ময়না।

ময়না হাত দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিতে শাড়ির আঁচল খসে পড়ল। এই বুঝি ডানা মেলে উড়ে যাবে। আজ চাঁদের জ্যোৎস্না দারুন ফিনকি দিচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে সব। সামনের পুরষটিকে চাঁদলাগা জোছনায় পাঞ্জাবি, পাজামা পরে যেন কোনও সাদা পুরুষ মনে হল।

সুজন দেখল, মাঠের এখানে ওখানে কেউ কেউ পরি নিয়ে ঘুরছে হাত ধরাধরি করে, তারপর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ঝোপেঝাড়ে। ওরা একটা উঁচু আলের ওপর বসে আছে। পায়ের নীচে নরম ঘাস। এই ধবধবে আলোয় কয়েকটা পাখি উড়ছে, কিচকিচ করে ডেকে উঠে কোন দিকে চলে গেল।

'ঝোপের দিকে নিয়ে যাবেন না?' ময়না বলল।

'শরীরটা ভালো নেই, থাক না। তবে তোমার টাকা আমি দিচ্ছি। ওই শ্যামল এজেন্ট বলেছিল, পরির বয়স পঁচিশ হলে একশো দিতে হবে। তোমার বয়স কত?'

'আসছে বছর পঁচিশে পড়ব।'

সুজন কাঁধের ঝোলা সামনে এনে একশোর একটা নোট ময়নাকে দিল। টাকাটা সে আঁচলে বাঁধল।

একটা গাছের ছায়ায় বসল দু'জনে। খালে খড় বোঝাই একটা নৌকো চলে যাচ্ছে। খালের চরে কতকগুলো সাদা কোঁচবক। খালের দিকে ঝুঁকে থাকা বাঁশবনের কঞ্চিতে দোল খাচ্ছে মাছরাঙা।

'আপনি থাকেন কোথায় গো বাবু?'

'আগে আমি এদিকেই থাকতাম। তখন আমার দুধ আর সবজির ব্যবসা ছিল, পরে শহরে চলে গেলাম। অনেক বছর পরে এদিকে আজ এলাম। ওই যে পদ্মমাসি, স্টেশনে যে চপ ফুলুরি ভাজে, ওকে আমি চিনি।'

'ওমা! তবে তো তুমি আমাদের ঘরের লোক গো।'

'আমাকে তোমার ঘরে কয়েকদিন রাখবে? আমি টাকাপয়সা দেব। ঘরে তোমার কে আছে?'

'মা ছাড়া কেউ নেই। থাকবে আমার ঘরে? চলো। তবে, লাল চালের ভাত, শাকপাতা আর একটু ডাল জুটবে।'

'তা কেন? আমি রোজ টাকা দেব, সবজি মাছ আনবে। কোন দিকে তোমার গাঁ?'

'ওই তো বাঁদিকে মাঠের কোণে কালো কালো গাছপালা দেখা যাচ্ছে, ওখানে পাশাপাশি তিনটে গাঁ— টগরতলা, পদ্মতলা, চাঁপাতলা। আমার বাড়ি টগরতলায়।

'লোকে কিছু বলবে?'

ময়না একটু ভাবল। বলল, 'তুমি আমার মামার বাড়ির লতায়পাতায় সম্পর্কের লোক। গাঁ-ঘরে এমন কত হয়, দূরের মানুষ ঘরে আসে না? ওই রকম। সে আমি সামলে নেব। নাও, এখন চলো। রংকলের ওদিকে একটা রাস্তা আছে গাঁয়ে যাওয়ার।'

সুজন মাঠপরিকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

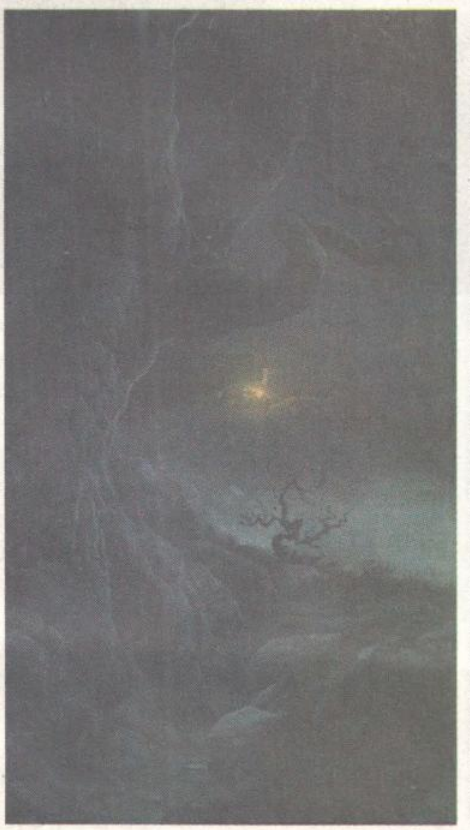

দুই

একদিন ময়না দুপুরের দিকে সুজনকে নিয়ে গাঁয়ের শেষ মাথায় জঙ্গলের ভেতরে মা বনকালীর থানে নিয়ে গেল।

জঙ্গলটা ঝিম-নির্জন, কোথাও কোনও পাখি ডাকছে না, হাওয়া উঠলে ডালপালায় কটকট আওয়াজ, পাতার শব্দ সিপ-সিপ। মন্দির বলে কিছু নেই। ভাঙাভুঙো একটা খড়ো চালের ঘর। থানের মাটি বর্ষার ঝাপটায় ধুয়ে গেছে।

পাঁচ হাত উঁচু মা বনকালী। তার ডান হাতে খড়্গ, বাঁ হাতে মানুষের মাথা। গলায়, কোমরে মুণ্ডমালা, রং ঘোর কালো। থানের মাটি ফুঁড়ে চারপাশে ভেরেণ্ডা আকন্দের ঝোপ। ঝোপগুলো ঘিরে ফেলেছে মা বনকালীকে।

চৈত্র মাসের শেষে অমাবস্যায় পুজো। ঝোপঝাড়, আগাছা তখন সাফ হবে। মাটি পড়বে কালীর থানে। কালীর গায়ে, তে-মাটির পরে নতুন রং। তিন দিন মেলা বসে। তখন সারারাত হেজাকের আলো। হাড়িকাঠে ছাগ বলি। কেঁপে ওঠে বনপ্রান্তর— 'জয় মা, জয় মা বনকালী।' মেয়েরা মানত করে। কালীথানের পুকুরে চান করে ভিজে কাপড়ে দণ্ডি কাটে।

হাঁটু মুড়ে, জড়ো হাতে, চোখ বুজে মানত করল ময়না— 'মাগো, মানুষটাকে যখন এনেছ, ফিরিয়ে নিও না।' গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করল। একজোড়া জবা রেখে দিল মায়ের পায়ে। একটা ধূপ জ্বালিয়ে উঠে দাঁড়াল।

দু-হাত তফাতে সাদা পাঞ্জাবি-পাজামার মানুষটা দাঁড়িয়ে। ওকে নিয়ে জঙ্গলের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে ময়না যেদিকে এল, এদিকটা ফাঁকা জঙ্গল, মাটি ঢালু হয়ে নীচে নেমেছে, ওখানে একটা চওড়া খাল, খালটা তিন গাঁকে জড়িয়ে দূরের বড় নদীতে মিশেছে।

একটা গাছের ছায়ায় বসল দু'জনে। খালে খড় বোঝাই একটা নৌকো চলে যাচ্ছে। খালের চরে কতকগুলো সাদা কোঁচবক। খালের দিকে ঝুঁকে থাকা বাঁশবনের কঞ্চিতে দোল খাচ্ছে মাছরাঙা।

'কী মানত করলে?' সুজন বলল।

'তুমি যেন এখানেই থাকো, আমাদের টগরতলার মাটির বাড়িতে।'

'আছিই তো তোমার সঙ্গে।'

'যেদিন থেকে তুমি আমার ঘরে, আমি মাঠপরি হয়নি। কী সুখেই যে আছি! আমার ঘরদোরে যেন ফুল ফুটছে।'

সুজন তাকাল ময়নার দিকে। কী হল মেয়েটার? এমন বলছে কেন? মা বনকালী কী ভর করল? কিছু যেন বলতে যাচ্ছিল সে, শরীরে আবার সেই ঘোরঘোর ভাবটা ফিরে এল। সব যেন দুলছে। মাথার দুপাশে সেই যন্ত্রণা, সেই ঝাপসা।

ঝাপসাভাব নিয়ে সুজন দেখল, চারপাশের গাছপালা যেন ওদের আড়াল করে দিল। বেশ গাঢ়, ঠান্ডা বনছায়া। কোথায় যেন ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে এদিকে, কুর্চিফুলের গন্ধ জঙ্গলে ও-ফুল খুব ফোটে। বড় এলোমেলো লাগছে সুজনের। শরীরের ভার ছেড়ে দিল ময়নার গায়ে, দু-হাতে জড়িয়ে ধরল। চোখ বুজল ময়না। ঠোঁট উঁচু করে ধরল কিছু

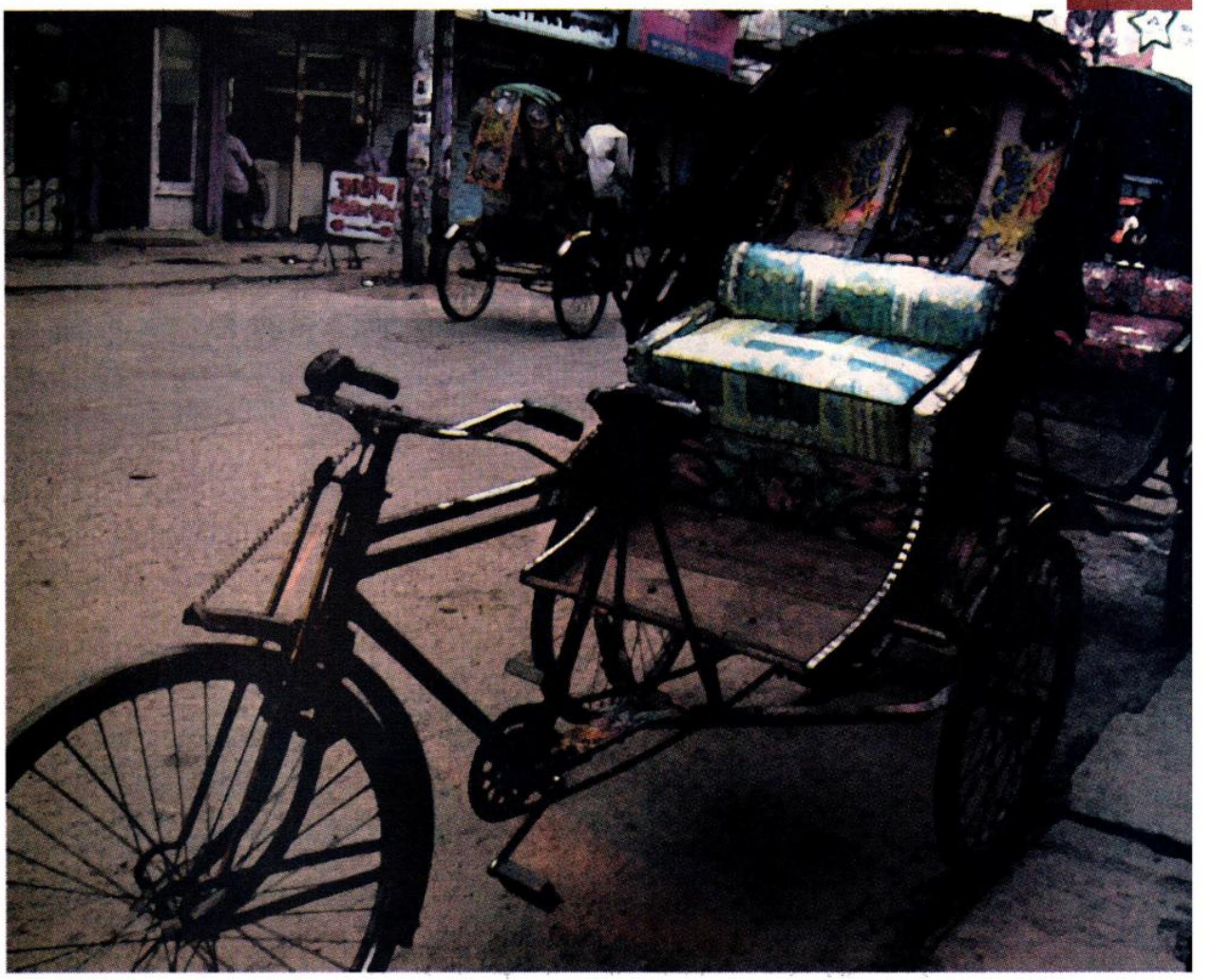

পাওয়ার আশায়। নরম গলায় বলল, 'জঙ্গলে কেউ নেই এখন।'

নিজেকে একটু থিতিয়ে নিয়ে সুজন বলল, 'তুমি ময়না না, মাঠপরি না, বনপরি।' হাসল ময়না। 'বনপরিই তো ডানা নেই, মেয়েমানুষ।'

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে সুজন নিজেকে ফিরে পেল। ঘরের উঠোনে তখন নির্জন ভোরের বাতাসে বাতাবি ফুলের গন্ধ। হালকা নরম রোদ। উঠোনে বনচড়ুই নেমেছে। কী স্নিগ্ধ সকাল!

মনে পড়ে গেল সব কিছু। সে তো কোনও এক দুপুরে কফিহাউস যাবে বলে ঘর থেকে বেরিয়েছিল। এ গাঁয়ের নাম টগরতলা, স্টেশনের নাম কুসুমতলা, কর্ডলাইনের স্টেশন। ঘরের যুবতী মেয়ে যার নাম ময়না, সে-ই বা কে?

ময়নাকে ডেকে সব কিছু খুলে বলল সুজন।

সে এদিকের মানুষ নয়। তার একটা পুরোনো অসুখ আছে। অসুখটা হলে, কিছু মনে থাকে না। বহু পুরোনো ঝাপসা স্মৃতি জেগে ওঠে। সেটা গত জন্মের হতে পারে কিংবা এ জন্মের। তারাই তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় এখানে ওখানে। সে রকমই সে ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছিল টগরতলায়। শহরে তার বাড়িঘর আছে, বউ আছে, এবার তো ফিরতেই হয়।

ময়নাও বুঝতে পারল, এবার দু'জনের ছাড়াছাড়ি হওয়ার পালা, চোখে জল নিয়ে ঘরের দরজা খুলে বলল, 'যাও।'

মা বনকালী তার মানত পূর্ণ করল না। দু-দিনের সুখটা ছিল ভিজে পাতায় বৃষ্টির ফোঁটার মতো, গড়িয়ে পড়ে গেল ধুলোয়। সে মাঠপরি, মাঠের সুখেই তাকে বেঁচে থাকতে হবে।

সুজন ঘরের বারান্দায়। খোলা দরজা দিয়ে আবার ভেতরে ফিরল।

দরজা বন্ধ করে, ময়নাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি যাচ্ছি না, আরও কিছুদিন তোমার কাছে থাকব।'

এক উদাসীন, সম্পর্কহীন পুরুষের আদরে ময়নার চোখে চুপিচুপি কান্না নেমেছে। সুখের কান্না। ❖

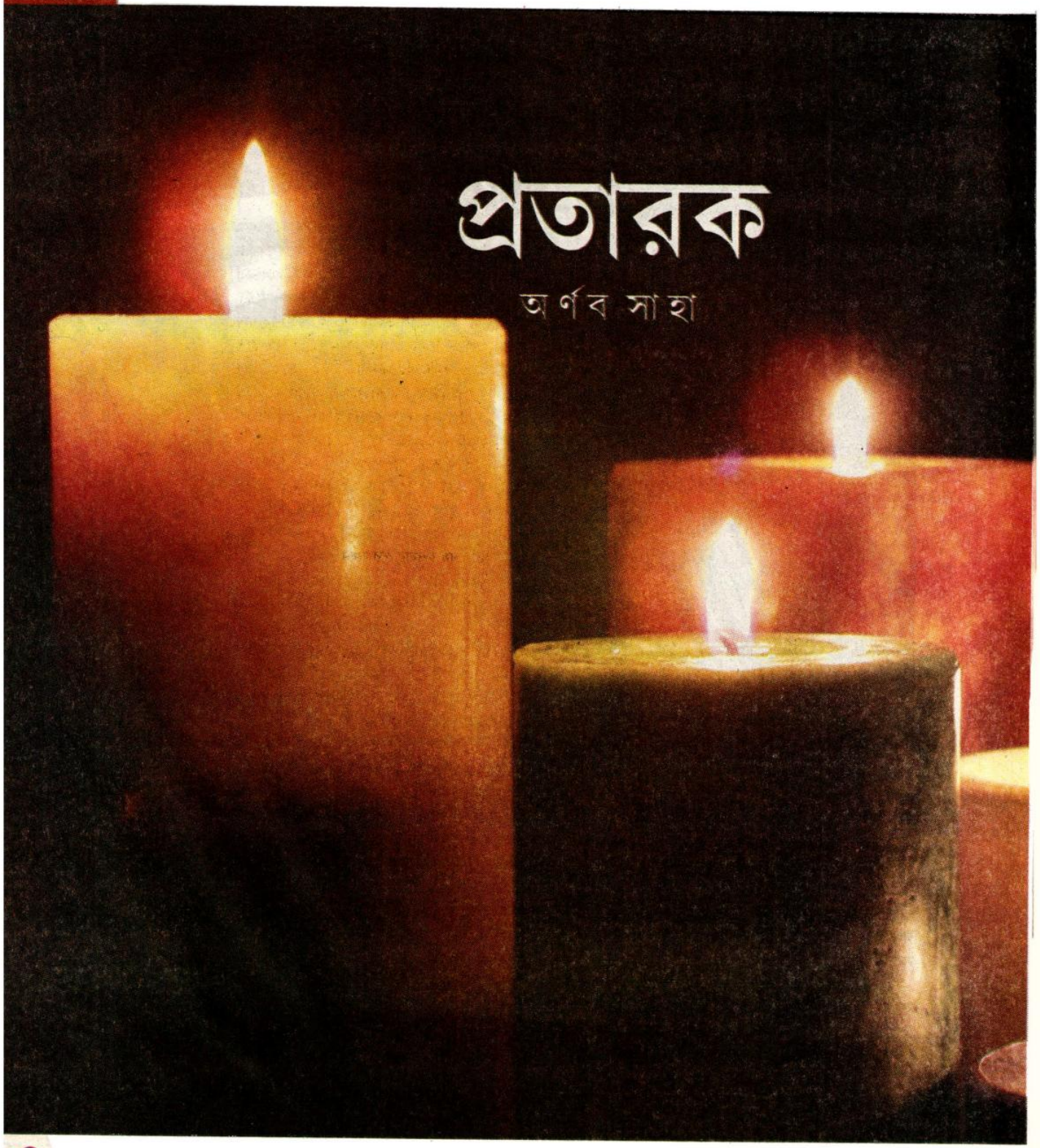

প্রতারক

অর্ণব সাহা

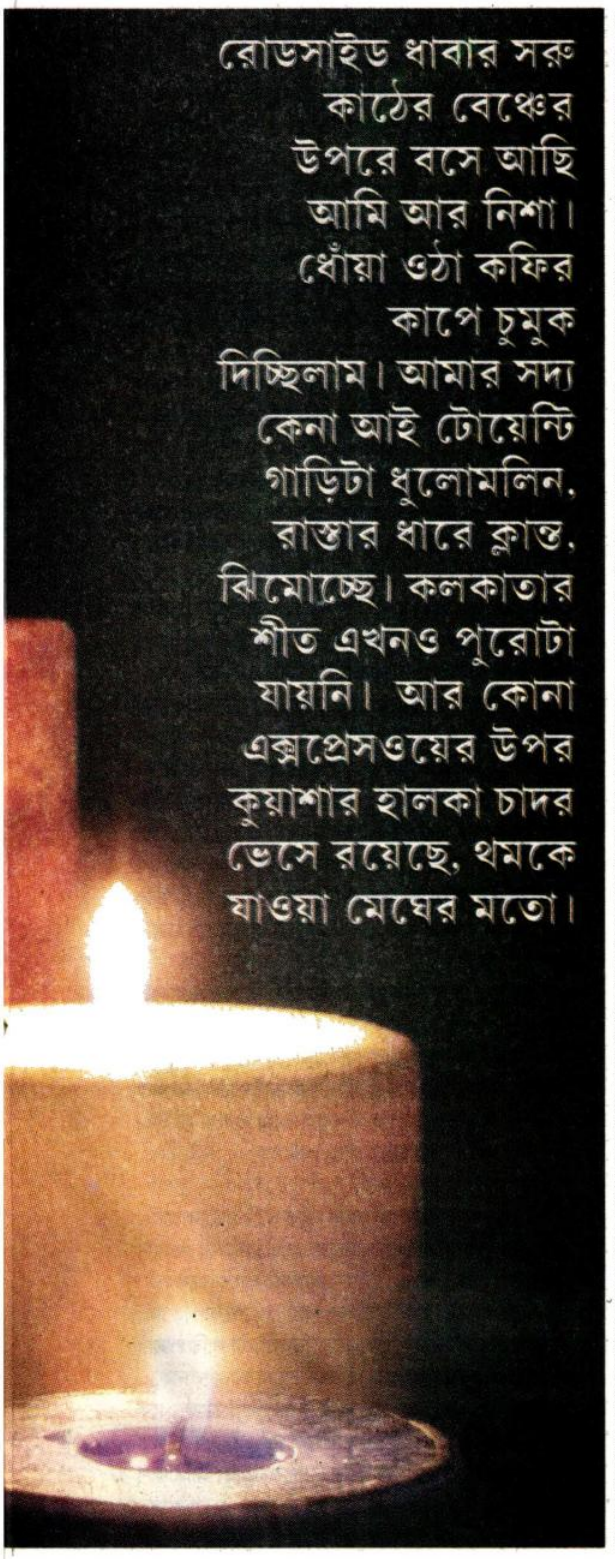

সূর্য উঠেছে। সেই অস্পষ্ট আলোয় আমি নিশাকে দেখছিলাম। এক একটা মুখ সৌন্দর্যের অতীত, অবিন্যস্ত চুলে রাত শেষ হওয়ার চিহ্ন, কারণ দিনের শুরুয়াত মানে নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে আয়নার সামনে মেলে ধরা। ওর ফেডেড জিন্স, সোয়েটারের ভি গলার ফাঁক দিয়ে যিশুখ্রিস্ট আঁকা লকেট, একটা হাতের উপর ভর দিয়ে টেবিলের উপর কাত হয়ে আসা মাথা, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারছিলাম না। কফি ঠান্ডা হচ্ছিল।

হাইওয়ের উপর এই দামি হোটেলটার নাম 'পান্থনিবাস'। এমন ঝকঝকে বাংলো প্যাটার্নের বাড়িটার এত সেকেলে নাম কে রেখেছে ভগবান জানে। কাল রাতে আমরা এসে উঠেছি এখানে। আসলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। একটানা ড্রাইভ করে দিঘা বা মন্দারমণি যাব ঠিক ছিল। কিন্তু নিশা মেয়েটা পুরো খেপি। সন্ধ্যার একটু আগে ওর আবদারেই গাড়ি থামালাম এখানে। ঘরও পেয়ে গেলাম। গত তিন বছরে বহু রাত কলকাতার বাইরে কাটিয়েছি আমরা। কিন্তু প্রত্যেকবার ডেস্টিনেশন ঠিক করা ছিল। এবারের মতো আলটপকা জাস্ট ইচ্ছে করছে বলে কোথাও নেমে যাওয়া হয়নি। ঘরটা দারুণ অবশ্য। কমফর্ট জোনে পৌঁছে যাওয়ার মতো। একবার বিছানার পুরু গদিতে নিজেদের মিশিয়ে দিতে পারলে, গ্লাসে ঢালা স্মারনফ এসপ্রেসো গলায় চলে গেলে বাকি পৃথিবীর মুখের উপর অনায়াসে দরজা বন্ধ করে দেওয়া যায়। দিয়েওছি আমরা।

নিশার শরীর থেকে এখনও গত রাতের ঘ্রাণ ভেসে আসছে। গত রাতে, দু'পেগ শেষ হওয়ার পর যখন একটার পর একটা পোশাক ছেড়ে বিশুদ্ধ নগ্নতায় ও আমার উপরে উঠে বসল, চুলের ক্লিপ খুলে রেখে একরাশ বন্যার মতো বাঁধভাঙা চুল বেঁধে নিল আলগা খোঁপায়, আমার মনে হচ্ছিল বিগত তিন বছরেও এই শরীরটার প্রায় কিছুই চিনিনি আমি। এখনও প্রত্যেকবার এত নতুন আর সতেজ, সাবলীল লাগে ওকে। পুরো কাজটায় আমি নিষ্ক্রিয় থাকি কারণ এতটাই অ্যাকটিভ নিশা, ওর সম্পূর্ণ স্বাদটুকু পেতে হলে একটু দূরত্ব রাখতে হয়। এমনকী, মৈথুনের সময়েও। এত অ্যাগ্রেসিভ অথচ এত এলিগেন্ট শরীর হতে পারে, ওর কাছে না এলে জানতে পারতাম না হয়তো। ও যখন নিজের শরীরটা ঘুরিয়ে নেয় উল্টোদিকে, মনে হয় জলের ভিতর স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটা বিদ্যুতের রেখা। ওর শরীরের ঘন অন্ধকারে হারিয়ে যেতে যেতে নিজেকে দিগ্‌ভ্রষ্ট মনে হয়। আবার প্রত্যেকটি সঙ্গমের পর, ও যখন পাশ ফিরে শুয়ে থাকে, ওর দেহের কোনও না কোনও অংশ দিয়ে ছুঁয়ে থাকে আমায়। তখন ওই ভঙ্গিটাকে মনে হয় যেন বন্যার জলে ভেসে আসা একটা শিশুর হাত। ব্যক্তিগত জীবনে, এই বিয়াল্লিশ বছরে পৌঁছে, আমি আর কোনও স্থায়ী মধ্যবিত্ত সম্পর্কের নৈতিকতায় বিশ্বাস রাখি না। কারণ, দাম্পত্য থেকে পরিবার, প্রত্যেকটা সম্পর্কই আসলে কতকগুলো তুচ্ছ দেওয়া-নেওয়া, ক্ষমতা আর আধিপত্যের সম্পর্ক। আর, এই সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ভিকটিমাইজড হয় ছেলেরা। শেষ অবধি ধ্বংস হয় তারাই। মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি স্বপ্ন দেখতে চায় ছেলেরা। আর অচিরেই বুঝতে পারে দাম্পত্য, বিবাহ আসলে অজগরের পেটের ভিতর ঢুকে পড়ার মতো। যত ভিতরে যাবে, তত বেশি পাচক রসে জারিত হবে তার মাংস-মেদ-মজ্জা।

ওর শরীরের অন্ধকারে নিজেকে দিগ্‌ভ্রষ্ট মনে হয়। প্রত্যেকটি সঙ্গমের পর, ও যখন পাশ ফিরে শুয়ে থাকে, ওর দেহের কোনও না কোনও অংশ দিয়ে ছুঁয়ে থাকে আমায়। ওই ভঙ্গিটাকে মনে হয় যেন বন্যার জলে ভেসে আসা একটা শিশুর হাত।

এদিক থেকে নিশার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেকটাই ওপেন এন্ডেড, দু'দিক খোলা। আরও অদ্ভুত, সম্পর্কটা শুরু হয়েছিল নিছক বিনিময়ের অ. থেকে। ক্রমশ, চেহারা বদলেছে, নির্ভরতার জায়গা তৈরি হয়েছে। অথচ কোনও বাধ্যবাধকতার চাপ দু'জনের কারও দিক থেকেই কোনও দিন অনুভব করিনি আমরা।

চৈতির সঙ্গে যখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তখন আমাদের ছেলে তোজোর বয়স দুই। ছেলের কাস্টডি আমি চেয়েছিলাম, যা পাওয়া খুবই কঠিন, অন্তত আমাদের এখানে। সমস্যাটা কেবল লিগ্যাল নয়। বিরাট বড় ইমোশনও জড়িয়ে থাকে এর সঙ্গে। কিন্তু সেপারেশনের ঠিক পরপরই চৈতি নর্থ বেঙ্গলের একটা কলেজে লেকচারার হয়ে চলে যায়। ওদের আদি বাড়ি এলাহাবাদে, আত্মীয়স্বজন কেউ তেমন একটা নেই। ছেলের দায়িত্ব নেওয়া ততটা সম্ভব ছিল না ওর পক্ষে। তবু ও চেয়েছিল ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। অনেক বুঝিয়ে ওকে নিরস্ত করি। আমাদের টালিগঞ্জের ভূতের মতো বিশাল পৈতৃক বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা আর আমি। ভাই ফ্যামিলি সমেত চাকরিসূত্রে ব্যাঙ্গালোরে। বাবা-মায়ের ভরসাতেই তোজোর কাস্টডি চেয়েছিলাম আমি। পেয়েওছি। তোজো এখন সাত প্লাস। সাউথ পয়েন্টে পড়ে। অবিকল আমার সাত বছর বয়সের মতো বিষণ্ণ চোখ দুটো ওর অনেক কথা বলে। তোজোকে ছাড়া বেঁচে থাকা অর্থহীন আমার কাছে। চৈতি মাসে দু'বার আসে ছেলেকে দেখতে। রুবির কাছে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট কিনেছে ও। আমাদের অস্তিত্ব আসলে প্রি-অকুপায়েড ভাষার খাঁচায় বন্দি। অহং যার অপর নাম। মাঝে মাঝে আমার নিজেকে অহং-তাড়িত পঙ্গু বলে মনে হয়। আমাদের সাত-আট বছরের ইউনিভার্সিটির প্রেম আর সাড়ে চার বছরের দাম্পত্যের স্মৃতি ধূসর হয়ে ওঠে আমার কাছে। পুরো এগিয়ে চলার পথটাই খোলস তৈরি আর খোলস কেটে বেরিয়ে যাওয়ার একটা আলটপকা খেলা। কোনও সমস্যা নেই। ডেস্টিনেশন নেই। স্টার্টিং পয়েন্ট নেই। একটা বিস্তৃত মাকড়সার জালের ভিতর আটকা পড়ে যাওয়া পতঙ্গ যেন। সবটাই অভ্যাস। প্রেম কীরকম হবে, দাম্পত্য কীরকম হওয়া উচিত কোনও কিছুই জানতাম না। অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল সক্রিয় ছাত্র। রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলাম সে সময়। কেরিয়ার শেষ হয়ে যেতে বসেছিল। আমাদের বিয়েতে ফুলশয্যার খাট সাজানো হয়নি। বিয়ের রাতে আংটি পরাইনি চৈতিকে। এগুলো যে করতে হয় একবারের জন্য ভাবিওনি। চিন্তাও করিনি। আরও বহু কিছু খুঁটিনাটি যেগুলো একসঙ্গে থাকতে গিয়ে পদে পদে অনিবার্য সংঘাত গড়ে তুলছিল। জীবন হয়ে উঠছিল একটা ক্লোজড-সার্কিট টিভির সামনে বসে থাকা দুটো অক্ষম পাপেটের হাত-পা নাড়া। বিচ্ছেদ অনিবার্য জানতাম। তবু চেষ্টা করেছিলাম দু'জনেই। তবু তোজো এসেছে। এখন দিনের পর দিন কেটে যায় চৈতির মুখটাও মনে পড়ে না। একটা নির্ভার শূন্যতার মধ্য দিয়ে হেঁটে চলছি মনে হয়।

এগারোটা বেজে গেছে। বাথরুম থেকে শাওয়ারের আওয়াজ আসছিল। আমি আস্তে হাতল ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলাম নিশার নগ্ন শরীরটাকে। আমার হাতের মুঠোয় ওর দুই স্তন। দৃঢ় অথচ পাখির পালকের মতো নরম।

এই নিতান্ত টিন এজ পার করা মেয়েটির মুখ আমার ভীষণ চেনা। ভীষণ। কোথায় দেখেছি ওকে? কোথায়? বেশ কয়েকবছর আগে দেখা একটা আবছা মুখ? যার কথা ভাবছি, এ কি সেই মেয়েটাই?

বিয়ের আগে আমি আর চৈতি বেশ কয়েকবার একসঙ্গে স্নান করেছি। বিয়ের পর আশ্চর্যজনকভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। শেষদিকে তো শারীরিক সম্পর্ক প্রায় ছিলই না। সন্তানের জন্ম একটা রিচুয়ালের মত ব্যাপার। নিয়মিত সংসর্গ ছাড়াও ঘটে যায়। অ্যাক্সিডেন্ট।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামছে। আলোর জোর ফিকে হচ্ছে। আমার তর্জনিটাকে মুঠোয় চেপে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে নিশা। ওর মুখে এখনও একটা অদ্ভুত নিষ্পাপ হাসি। কেউ বলবে না টাকার বিনিময়ে একাধিক লোকের বিছানায় শুতে হয় ওকে। হয়তো তিন বছরের পথ চলায় আমার উপর কিছুটা হলেও নির্ভর করে ও। যদিও ভিতরে ভিতরে অসম্ভব শক্ত মনের মেয়ে ও।

দরজায় বেল বাজল। কফি দিতে এসেছে বোধহয়। পাজামার দড়িটা শক্ত করে নিয়ে ছিটকিনি খুললাম। অন্ধকার নামতে শুরু করেছে।

চৈতির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর মারাত্মক ডিপ্রেশন শুরু হয়েছিল। শহরতলির এক অখ্যাত কলেজে ইতিহাস পড়াই আমি। যে কলেজ প্রায়ই উত্তপ্ত রাজনৈতিক লড়াইয়ের কারণে খবরের শিরোনামে আসে। ছাত্র সংখ্যা এমনিতেই কম। আর ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী তো আরওই কম। ফলে আমার হাতে সময় অনেকটাই থাকে। অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে একটার পর একটা ভারী থিয়োরির বই পড়ে শেষ করি আমি। স্টাফরুমে বসেই। প্রায় এক-দেড় ঘণ্টা অন্তর বাড়িতে ফোন করে তোজোর খবর নিই। সপ্তাহে তিন বা চার দিন খিদিরপুর থেকে ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাই পার্ক স্ট্রিট। অলি পাবে। এক কোণে বসে একা একা মদ খেতে বেশ লাগে। নির্মোক খসিয়ে ফেলার যে চেষ্টা শুরু করেছিলাম, আকস্মিকতার কাছে আত্মসমর্পণের যে খেলাটা আপনা থেকেই আমার জীবনে এসেছিল, সেই সুতোর জট ছাড়াচ্ছিলাম। সেদিন ছিল শুক্রবার। নিজের ভিতরে ডুবে ছিলাম। একটা মাঝবয়সি লোক আমার টেবিলে এসে চেয়ার টেনে বসল।

—কী খবর তোর? এমন ভেঙেচুরে গেছিস কেন? লোকটা বলল।

আমি অন্যমনস্ক থাকায় প্রথমটা চিনতে পারিনি। মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল মাথার ভিতরে। আনন্দের ঝিলিক আর সতর্কতার টানটান স্নায়ুপ্রবাহ একসঙ্গে কাজ করলে যা হয়। আমার চেনা ইনস্টিংক্ট ফিরে আসছে।

—দীপাংশুদা, তুমি এখানে!

—কাজের চাপ কম থাকলে মাঝে মাঝে আমি এখানে আসি। এ জায়গাটা সস্তা। তারপর? তোর সেপারেশনের খবরটা পেয়েছিলাম। কেমন আছিস তুই? বাচ্চা কার কাছে থাকে?

—আমার কাছেই। তুমি এত খবর পাও কোত্থেকে?

—রাখতে হয়। সবাই তোর মতো বিপথগামী নাকি? আর পড়ানোর চাকরি চলছে? পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা?

কথাটার মধ্যে খোঁচা আছে। হয়তো দীপাংশুদার তরফ থেকে খোঁচাটার সঙ্গত কারণও আছে। কিন্তু এখন এই সব ফালতু বিতর্কে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। নেশাটা সবে চড়ছে। আমি পাশ কাটাতে চাইছিলাম। প্রসঙ্গ ঘোরাতে চাইছিলাম।

—তোমার এরকম শেয়ালমার্কা চেহারা হল কীভাবে?

—সে অনেক কথা। গলার স্বরটা একটু নিচু পর্দায় এনে দীপাংশুদা বলল, সবকিছু বদলে গেছে অভি। তোর একা লাগে না? আর্জ ফিল করিস?

—সেক্সুয়াল আর্জ? মরে গেছে দীপাংশুদা।

—চার অক্ষরের গালাগাল দেব তোকে। চল ওঠ।

—কোথায়?

—এক জায়গায় নিয়ে যাব তোকে। পার্স ভর্তি আছে তো?

—তার মানে? কোথায় যাব আমি? আমায় বাড়ি ফিরতে হবে। ছেলেকে আমি খাওয়াই রাতে।

—রাত হতে এখনও বাকি। নিজেকে কষ্ট দিস না। চল আমার সঙ্গে। ট্যাক্সিটা কোন ঘুরপ্যাঁচের রাস্তায় চলছিল বুঝতে পারছিলাম না। তবে মনে হল জোড়া গির্জার কাছে কোথাও একটা থেমেছে। বেশ পুরোনো দামি পাড়া। সন্ধের অন্ধকার। রাস্তায় লোকজন কম। একটা সরু গলি দিয়ে কয়েক পা হাঁটার পর সদ্য রং করা হাল ফ্যাশানের দোতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়িটার সামনে এসে থামলাম আমি আর দীপাংশুদা।

দোতলায় বিরাট গ্লোসাইন ব্যানার জ্বলজ্বল করছে। 'শাইনিং পাথ'। তার নীচেই হলুদের উপর ছোট্ট লাল অক্ষরে লেখা 'স্পা অ্যান্ড অ্যারোমা মাসাজ'।

দ্রুত বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদা আগুনখোর বিপ্লবী ছাত্রনেতা দীপাংশু চ্যাটার্জি এখন মাসাজ পার্লারে ক্লায়েন্ট সাপ্লাই করে। আমার আরও হাসি পেল সেন্টারের নামটা দেখে। 'শাইনিং পাথ'? আশির দশকে পেরুর সবচেয়ে বড় মাওবাদী গেরিলা সংগঠনের নাম। যারা পেরুর সরকারকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ওদের নেতা ছিল আবিমায়েল গুজমান ওরফে কমরেড গঞ্জালো। ওরা স্বপ্ন দেখতে চাইত পেরুতে গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার। আর একটা গেরিলাদল ছিল 'টুপাক আমারু'। শেষ অবধি কিছুই ঘটেনি। রাষ্ট্রশক্তি হিংস্র রক্তের বন্যায় যাবতীয় প্রতিরোধ ধ্বংস করে দেয়।

সেটা আশির দশকের শেষ। নব্বইয়ের শুরু। আর আজ ২০১০। মধ্য কলকাতার একটা অচেনা পাড়ায় আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। নারী শরীরের স্বাদ পাইনি প্রায় সাত-আট বছর। একটা সফিস্টিকেটেড নারী মাংসের দোকান। নাম 'শাইনিং পাথ'। যে বিলাসবহুল ঘরটায় আমাকে এনে বসাল দীপাংশুদা, তার ভিতরে কাচের স্লাইডিং ডোর লাগানো শাওয়ার রুম। পুরু গদির বিছানায় দামি চাদর, ধবধবে টাওয়েল পাতা। একপাশে দামি সোফাসেট। যেখানে এখন বসে আছি আমি। একটা অদ্ভুত শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছে আমার। উত্তেজনা?—আছে। পাপবোধ? ভয়? —নেই।

যে মেয়েটা ভিতরে ঢুকল, তার বয়স খুব বেশি হলে উনিশ-কুড়ি। আমার কলেজের অনার্স ক্লাসের একটি মেয়ের মতোই। ইনোসেন্ট। এনার্জেটিক। টাইট জিনস আর টিশার্ট পরা। অত্যন্ত পেশাদারের দক্ষতায় দরজা বন্ধ করল সে। বলল, আপনি কোনও ড্রিংকস নেবেন? সফ্‌ট কিছু? আনাব?

কোমরে শুধুমাত্র টাওয়েল জড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম আমি। অতীব সরু টু-পিস পরে মেয়েটা খাটে উঠল। আমার ঘাড়ে, পিঠে, কোমরে, পায়ে খেলতে শুরু করল ওর মায়াবী আঙুল। অবশ লাগছিল আমার। একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকের মতো মাথার ভিতর হাতুড়ি ঠুকছিল কেউ।

শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল রক্তের স্রোত আমাকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল অনেক কিছু।

এই নিতান্ত টিন এজ পার করা মেয়েটির মুখ আমার ভীষণ চেনা। ভীষণ। কোথায় দেখেছি ওকে? কোথায়? বেশ কয়েকবছর আগে দেখা একটা আবছা মুখ? যার কথা ভাবছি, এ কি সেই মেয়েটাই? বোঝাই যায় লাইনে সদ্য এসেছে। যে ক'টা শব্দ ওর মুখে শুনলাম তার ভিতর একটা শব্দ 'প্রহেলিকা'। কোনও বেশ্যা 'প্রহেলিকা' শব্দটার মানে জানে? কে এই মেয়েটা? দীপাংশুদা কোথায় এনে ফেলল আমায়?

বলাই বাহুল্য সেদিন কিছুই করতে পারলাম না। উঠলই না আমার। কেবল অসহায়ভাবে প্রশ্ন করলাম 'তোমার নামটা তো বললে না!'

'আমার নাম? নিশা।' বেশ সাবলীলভাবে বলল সে।

এখানে কেউ নিজের আসল পরিচয় দেয় না। কিন্তু আমার মাথার ভিতর তখন ঘুরপাক খাচ্ছে বেশ কয়েক বছর আগের একটা বর্ষার রাত। কম পাওয়ারের বাল্বের আলো। পোশাক পরে নিয়েছে ও। দুটো একশো টাকার নোট টিপস দিলাম ওকে। শেষে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। মরিয়া হয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলাম ওর দিকে—

—তোমার বাড়ি কি বারাসত? কলোনি মোড়?

সিরিঞ্জ দিয়ে শরীরের যাবতীয় রক্ত শুষে নিলে যেমন হয়, মুহূর্তের ভিতর মুখটা তেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর। বুঝলাম অব্যর্থ গুলিটা বুল্‌স আই-তে লেগেছে। আমার দিকে ফিরে তাকাল নিশা। ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফুঁসছে যেন সে। তারপর, ফণা নামিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে জানতে চাইল—কে আপনি?

—সেটা জরুরি নয়। আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি আমি।

—আমার নাম নিশা। আর হ্যাঁ, পেমেন্টটা দীপাংশুদার হাতে দেবেন। চলি। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে দরজা খুলে বেরিয়ে যায় মেয়েটি। কাউন্টারে মৃদু সেতার বাজছে তখন।

২০০১ সালের ৬ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার গোটা দেশব্যাপী জনযুদ্ধ গোষ্ঠীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। নব্বইয়ের শেষদিক

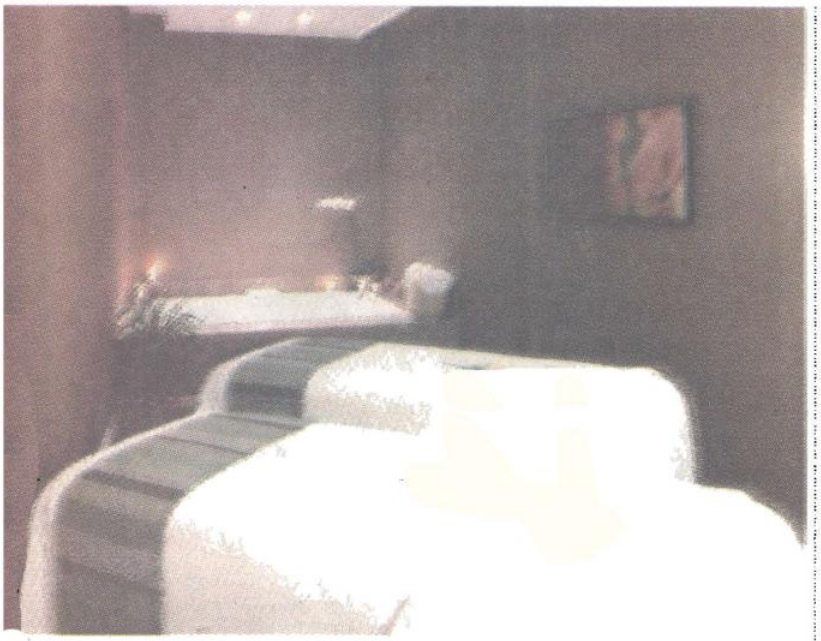

থেকেই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার জঙ্গল এলাকায় ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ড থেকে গেরিলা স্কোয়াডগুলো ঢুকতে শুরু করে। বেলপাহাড়ি, শালবনি, গোয়ালতোড়, লালগড়, রায়পুর, রানিবাঁধ, সারেঙ্গা, পাঁচমুড়ায় কাজ করতে শুরু করে বাংলা-ঝাড়খণ্ড-ওড়িশা সীমান্ত কমিটির সক্রিয় কর্মীরা। সেই সঙ্গে চলতে থাকে পুলিশি ধরপাকড়, সিআরপিএফের তৎপরতা। ক্ষমতাসীন পার্টির সঙ্গে ছোটখাট সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটতে থাকে। ফলত, জঙ্গলমহলে পার্টি কর্মীদের উপর চাপ বাড়তে থাকে। আমাদের পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সন্তর্পণে সংগঠন ছড়িয়ে দিতে হবে। বিশেষভাবে টার্গেট করা হয় কলকাতা ও আশপাশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজকে। আমাদের যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পার্টি ইউনিটি গ্রুপের একটা পুরোনো সংগঠন ছিল। পার্টি সংগঠন তৈরি হয়। ইউনিভার্সিটি কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলাম আমি। আমার চেয়ে একটু সিনিয়র ছিল দীপাংশুদা, রাজাদা, প্রসূন, দেবতোষদা এরা। আমাদের প্রভাব তেমন একটা ছিল না ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। খানিকটা গুহ্য সংগঠনের মতোই অ্যাক্টিভিটি ছিল আমাদের। পুরোনো গান্ধি ভবনের সিঁড়ি, ঝিলপাড়, মেইন লাইব্রেরির সামনের চত্বরে মিটিং বসত প্রতি সন্ধ্যায়।

এম. ফিলের রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে তখন। পি.এইচ.ডি রেজিস্ট্রেশন করিয়েছি। কিন্তু কাজকর্ম একচুল এগোচ্ছে না। চৈতির সঙ্গে উদ্দাম সম্পর্ক আর নিষিদ্ধ রাজনীতির সঙ্গে একটু একটু করে জড়িয়ে যাওয়া। অন্ধ্রপ্রদেশের করিমনগরে পুলিশি এনকাউন্টারে মারা গেল জনযুদ্ধ-র তিন সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য শ্যাম-মহেশ-মুরলি। আমাদের ইউনিট থেকে আমাকে দায়িত্ব দিল এই রাষ্ট্রীয় হত্যার বিরুদ্ধে চার পাতার একটা পুস্তিকা লেখার। পরে ভেবে দেখেছিলাম আমাকে ওরা ওদের সঙ্গে রেখেছিল লিফলেট, ম্যানিফেস্টো, পোস্টারের বয়ান লেখার কাজে লাগাবে বলে। হাতে কালাশনিকভ নিয়ে অ্যাকশন করাটা আমার কলজেয় কুলোবে না। প্রায় দুই বছর উদ্‌ভ্রান্ত এই কানাগলির রাজনীতির ভিতর শক্তিক্ষয় করার পর একদিন টের পেলাম জীবন থমকে গেছে পুরোপুরি। গ্রাউন্ড রিয়্যালিটির সঙ্গে যোগ না থাকলে কোনও রাজনীতিই টিকতে পারে না। এ কথাটা সেই ১৯৬৯ সাল থেকে আজ অবধি বোঝেনি যারা, নিজেদের ক্ষুদ্রতম ইগো চরিতার্থ করা ছাড়া তাদের আর কোনও দায় আছে বলে আমি মনে করিনি। আর কোন সুদূর করিমনগর, ওয়ারাঙ্গল, দণ্ডকারণ্য, গড়চিরোলিতে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা গড়ে উঠেছে, তাতে আমাদের উৎফুল্ল হবার কী আছে বুঝতে পারিনি। আমার সহপাঠী একদা-বন্ধু সরকারি বামপন্থী ছাত্ররা তখন একে একে স্টেট ফেলোশিপ সিএসআইআর এমনকী কলেজে লেকচারারের চাকরিতে ঢুকে পড়ছে। চরম ফ্রাস্টেশনে নিজের হাতের শিরা কেটে ফেলতে ইচ্ছে করত। কিন্তু এই উদ্ভট রাজনীতির হাঁ মুখ একবার গিলতে শুরু করলে আর বেরোতে দেয় না। বেরোনোর রাস্তা নিজের কাছেই অপরিচিত হয়ে ওঠে নিজের। তখনই খবর পাচ্ছিলাম, এই আত্মক্ষয়ী দিশাহীন রাজনৈতিক লাইনের বিরুদ্ধে পার্টির ভিতরেই কথা শুরু হয়েছে। কলকাতা শহর কমিটির ভিতর সেই গ্রুপটাকে লিড করছে রাজাদা। ইতিমধ্যে বাসভাড়া বিরোধী আন্দোলন, ভিসিকে ঘেরাও করা জাতীয় পেটি কর্মসূচি ছাড়া ইউনিভার্সিটি কমিটির সদস্যরা সেভাবে কোনও অ্যাকশনে নামেনি। জানতে পারলাম গড়ফার কর্পোরেশন বরো অফিস ভাঙচুরের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সন্ধের পর সাত-আট জনের একটা স্কোয়াড বরো অফিসে ঢুকে হামলা চালাবে। চূড়ান্ত মিটিংয়ের দিন আমি আর চুপচাপ থাকতে পারলাম না। সরাসরি প্রসূনকে চ্যালেঞ্জ করলাম:

—তোর অনেক মাথামোটা কাজ আমরা সহ্য করেছি। এবার থাম।

—চুপ কর। ভিতু কাপুরুষ কোথাকার। চৈতির আঁচলের তলায় লুকো গিয়ে।

—মুখ সামলে কথা বল প্রসূন।

—এখনও কথা বলিনি অভি। এবার বলব। এই অ্যাকশনে তুই লিড করবি।

—অসম্ভব। আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেনি। মাথা ঠান্ডা কর।

—হিপোক্রিট! দুপুরবেলায় তোর বাড়িতে চৈতি কী করতে যায় আমরা জানি না ভেবেছিস? তোর আরও সব অ্যাক্টিভিটি আমি জানি। নেক্সট রাজ্য কমিটির মিটিংয়ে তোর চামড়া ছাড়াব আমি।

—ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ টেনে আনছিস? এই সামান্য বিশ্বাসটুকু যেখানে রাখতে পারিস না, সেখানে নয়া গণতন্ত্র মারাস। অ্যাবনর্মাল!

—লোকাল কমিটির অন্তত তিনজন নেতার সঙ্গে তুই গোপনে যোগাযোগ রাখিস। ওদের ছাত্রফ্রন্টের নেতারাও তোর বন্ধু!

—বাজে কথা বন্ধ রাখ। ব্যক্তিগত সম্পর্কে আর রাজনীতি গোলাস না। রাজ্য কমিটির মিটিংয়ে আমিও নিজের কথা বলব।

ইতিমধ্যে রাজাদার সঙ্গে আমাদের দু'তিনজন আলাদা মিটিং করেছি। ঠিক হল, গ্রামাঞ্চলে গণ সংগঠন বর্জিত, হঠকারী, পার্টিলাইনের বিরুদ্ধে থিসিস লিখে রাজ্য কমিটিতে জমা দেব

আমরা। রাজাদার পার্টিতে গোপন নাম ছিল 'মানিক'। তাই আমাদের থিসিসের নাম হবে 'কমরেড মানিকের দলিল'। গণবিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী পেটি বুর্জোয়া অধঃপতি পার্টি লাইনকে ক্রিটিক করা হবে। দলিলের পুরো ড্রাফট আমিই করলাম। কম্পোজও করলাম নিজের পয়সায়। সপ্তাহখানেক পর বারাসতের কলোনি মোড়ের একটা বাড়িতে রাজ্য কমিটির গোপন মিটিং বসল। এলেন হিমাদ্রি রায়। জনযুদ্ধ-র রাজ্য সম্পাদক। যার মাথার দাম কয়েক লক্ষ টাকা। আর ছিল বিকাশ। সেকেন্ড কম্যান্ড ইন চিফ। বিকাশদের ভাড়া বাড়িতেই মিটিং বসেছিল। আমি, রাজাদা, নিলয়, শাহিদ বক্তব্য পেশ করলাম। দলিল জমা দিলাম। কিন্তু যা ভেবেছিলাম তাই। প্রসূনরা আগে থেকেই আমাদের সম্পর্কে বিষিয়ে দিয়েছে হিমাদ্রিকে। রাজ্য নেতারা আমাদের পাত্তাই দিলেন না। উলটে আমাকে বলা হল শহরাঞ্চল থেকে সরে যেতে হবে। পশ্চিম মেদিনীপুরের গ্রামে যেতে হবে আমাকে আর নিলয়কে। কথাগুলো বলার সময় কমরেড হিমাদ্রির চোখদুটো হিংস্র চিতাবাঘের মতো জ্বলছিল। আমি কেবল ভাবছিলাম কীভাবে এই ঘোঁট থেকে পালাব। তখনই ঠিক করেছিল বর্ধমানে মেজো মাসির বাড়িতে চলে যাব। লুকিয়ে থাকব কয়েকমাস। রাজাদার সঙ্গে চোখের ইশারায় কথা হচ্ছিল। আমরা ক্রমশ বুঝতে পারছিলাম শহর কমিটি থেকে আমাদের বহিষ্কার করা হবে। আমরা কোণঠাসা হচ্ছি। কিন্তু মিটিংয়ের পর রাজাদা যা বলল তা আরও মারাত্মক। আমার সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ সত্যি মিথ্যা মিলিয়ে এমনভাবে জমা পড়েছে রাজ্য কমিটিতে যে, পার্টি মনে করছে আমি বিশ্বাসঘাতক। ক্ষমতাসীন বামপন্থী দল এমনকী পুলিশের সঙ্গেও গোপন যোগাযোগ আছে আমার— এটাই অধিকাংশ সদস্যের ধারণা। তাই পশ্চিম মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে নিয়ে গিয়ে খতম করা হবে আমাকে। আমার হাসি পাচ্ছিল, রাষ্ট্রশক্তির একটা লোমও ছিঁড়তে পারে না যে পার্টি, সে কত অনায়াসে সঙ্গী কমরেডের গলা কাটার হুকুম দিতে পারে। লজ্জা, ঘেন্নায় নিজেকে শেষ করে ফেলতে ইচ্ছে করছিল আমার। এই লোকগুলোর জন্য আমার এত ব্রাইট অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার বন্ধক রেখেছি আমি?

সেই রাতেই বর্ধমান চলে যাই আমি। তখনও মোবাইল ফোন হাতে হাতে ঘুরত না। রাজাদা আমার মাসির ফোন নম্বর জানত। বলল, খুব শিগগির দেখা করবে আমার সঙ্গে। অনেক কিছু করার আছে এখন। ছুটন্ত ট্রেনের জানলায় বসে অপসৃয়মান অন্ধকার গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকছিলাম। মিটিংয়ের পুরো ঘটনাটা যেন মাথার ভিতর হাতুড়ি বিঁধছিল। আমার ভবিষ্যৎ ইতিকর্তব্য তখনই স্থির করে নিয়েছি আমি। শুধু মাথার ভিতর ভেসে উঠছিল একটা ফর্সা, রোগা মুখ। বিকাশের এগারো বছর বয়সি বোন। নামটা জানা হয়নি। পর্দার আড়াল থেকে দেখছিল। মাঝে মাঝে চা এনে দিচ্ছিল আমাদের। একটা নিষ্পাপ, টলটলে মুখ।

মুখটা আর কোনওদিন ভুলতে পারব না আমি। সেদিনের সেই এগারো বছরের ছোট্ট মেয়েটাই আজকের নিশা। যার সঙ্গে গত তিন বছর পরতে পরতে জড়িয়ে গিয়েছি আমি। সে কারণেই প্রথম দিন নিশাকে দেখে চমকে গিয়েছিলাম আমি।

কিন্তু, আজ, এই মুহূর্ত অবধি এত সব ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানে না নিশা। এখনও আমার পাশে অকাতরে ঘুমোচ্ছে ও। সেই সরল, নিষ্পাপ মুখ ওর। কোনওদিন ওকে আমি জানতেও দেব না আমার জীবনের কোন আলো-ছায়াময় সুড়ঙ্গের ইতিহাসে জড়িয়ে রয়েছে ওর অস্তিত্ব। কিছু কথা গোপন থাকাই ভালো।

মানুষের প্রতিহিংসা মারাত্মক হতে পারে। প্রতিশোধস্পৃহা মানুষকে দানবে রূপান্তরিত করে। মানুষ যে কোনও কাজকে নিজের যুক্তিতে সাজায় অহং পরিতৃপ্ত করবে বলে। এক মাঝরাতে রাজাদা বর্ধমানে আমার মাসির বাড়িতে এল। ওর মুখেই শুনলাম শহর কমিটির সদস্যদের মধ্যে খাড়াখাড়ি বিভাজন ঘটে গেছে। দীপাংশুদা সমেত সাত-আটজন পার্টি ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছে। আর কয়েকজন বিকাশের সঙ্গে চলে গেছে পুরুলিয়ার সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলোতে। আমি ভেবেই নিয়েছিলাম ফিরতে আমাকে হবেই। গত তিন মাসে চৈতির সঙ্গে মাত্র দুবার দেখা হয়েছে আমার। ওর এম.ফিল প্রায় শেষ। স্কুল সার্ভিসে বসবে বলে তৈরি হচ্ছে ও।

আমিও নিজেকে তৈরি করছিলাম। গোপনে। ক্ষমতাসীন বামপন্থী ছাত্রফ্রন্টের বেশ কয়েকজন রাজ্যস্তরের সদস্যের সঙ্গে আগে থেকেই যোগাযোগ এমনকী বন্ধুত্ব ছিল আমার। উত্তীয়কে একদিন ফোন করলাম। শিয়ালদায় একটা চায়ের দোকানে বসলাম ওর সঙ্গে। খুলে বললাম গোটা পরিস্থিতি। উত্তীয় আমাকে নিয়ে গেল কলকাতা জেলা কমিটির এক প্রভাবশালী নেতার কাছে। তিনি আমার সম্পর্কে দেখলাম প্রায় সবকিছুই জানেন। ইন ফ্যাক্ট, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি বাম ছাত্র সংগঠনের দেখভালও তিনিই করেন। আমাকে বললেন, পিএইচডি-র কাজ মন দিয়ে শুরু করতে। ওরা দেখবেন আমার দিকটা। শর্ত একটাই। গোটা রাজ্য জুড়ে জনযুদ্ধ-র বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান জোরদার হতে চলেছে। আমাকে কয়েকটা

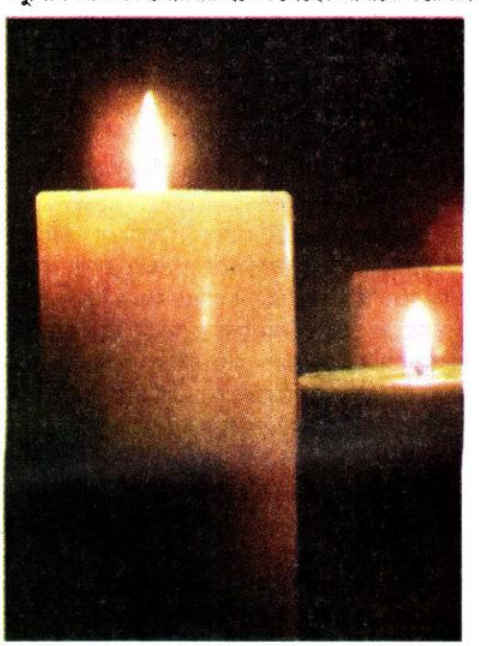

মানুষের প্রতিহিংসা মারাত্মক হতে পারে। প্রতিশোধস্পৃহা মানুষকে দানবে রূপান্তরিত করে। মানুষ যে কোনও কাজকে নিজের যুক্তিতে সাজায় অহং পরিতৃপ্ত করবে বলে।

তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে হবে। আমি রাজি হয়ে গেলাম।

আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির একটা নিজস্ব নেটওয়ার্ক থাকে, যা থেকে একবার বেরিয়ে গেলে তার হদিশ পাওয়া মুশকিল। কিন্তু দীপাংশুদা, রাজাদা আমায় বিশ্বাস করত। আমি ওদের কানেকশন ব্যবহার করছিলাম। কমরেড হিমাদ্রি রায় আর বিকাশের প্রত্যেকটা গতিবিধি আমিই জানাচ্ছিলাম সরকারি পার্টিকে। অবশেষে বছরখানেকের মধ্যেই সীমান্ত এলাকার পুরো কার্যকলাপ এবং সাংগঠনিক ব্লুপ্রিন্ট পুলিশের নখদর্পণে আসে। পুরুলিয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামে ভোররাতের খণ্ডযুদ্ধ অথবা এনকাউন্টারে খতম হয় বিকাশ। হিমাদ্রি রায় পালিয়ে যান। কিন্তু আড়াই সপ্তাহের ভিতরেই সোদপুর স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে থেকে ধরা পড়েন তিনি। সকালের খবর কাগজে পুরোটা জানতে পারি আমি। ব্রেকফাস্ট সারি। তারপর সারাদিনের জন্য ন্যাশনাল লাইব্রেরির উদ্দেশ্যে রওনা দিই। গবেষণার কাজ পুরোদমে চলছিল তখন। বিকেলে চৈতি এল দেখা করতে।

সেটা ছিল ২০০৪। অসম্ভব পরিশ্রমে বছরখানেকের মধ্যেই পি.এইচ.ডি শেষ করি আমি। ২০০৬-এর কলেজ সার্ভিসে শিকে ছেঁড়ে। আমি যে সাহায্যটুকু করেছিলাম ক্ষমতাসীন সরকারকে, তা ওঁরা ভোলেননি। বিশেষত কলকাতা জেলা কমিটির সেই প্রভাবশালী নেতা। ওঁর প্রত্যক্ষ সুপারিশেই খিদিরপুরের এই কলেজটায় চাকরি হয় আমার।

নিশা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। মাঝে মধ্যেই অদ্ভুতভাবে বিষণ্ণ হয়ে যায় ও। এইটুকু বয়সে গোটা সংসারের ভার ওর উপরে এসে পড়েছে। অসুস্থ বাবা-মা। দুটো ছোট ভাই-বোন। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষাটাও দিতে পারেনি ও। দাদা বিকাশ যখন মারা যায়, তখন সামান্যই বয়স ওর। ওর জীবনের এই অন্ধকার দিকটা ও আমাকে একদিনে বলেনি। একটু একটু করে বলেছে। আর আমি ওকে যা বলিনি, তা হল নিশার পুরো জীবনের গল্পটার নেপথ্যে আমার বিরাট বড় ভূমিকা থেকে গেছে। সেই ভূমিকার শুরুটা আমার তরফ থেকে ইচ্ছাকৃত। বাকিটা সম্পূর্ণ অ্যাক্সিডেন্ট। ওর সঙ্গে যোগাযোগ, সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া কোনও কিছুই পূর্বনির্ধারিত ছিল না। জীবন যে কোনও বিন্দু থেকেই বাঁক নিতে পারে। কোনও রূপরেখা আগে থেকে আঁকার চেষ্টা মিথ্যা। দর্শকের ভূমিকা নেওয়া ছাড়া শেষ অবধি কিছুই করার থাকে না আমাদের।

আসলে সমস্ত গল্পই একতরফা। আমি যে গল্পটা লিখছি সেটাও তাই। এর ভিতর কি চৈতির গল্পটা কোথাও লুকোনো রয়েছে? হয়তো আছে। কিন্তু মুছে যাওয়া কণ্ঠস্বর হিসেবে রয়েছে তার অস্তিত্ব। আমাদের সন্তানের সূত্রেই এখনও চৈতির সঙ্গে মোটামুটি নিয়মিত যোগাযোগ আছে আমার। এমনকী গতবছরও যখন অ্যাজমার অ্যাটাকে নার্সিংহোমে ভর্তি, দু'বেলা দেখাশুনো করেছি আমিই। এরকমই হয়। সম্পর্ক জট পাকানো গুলিসুতোর মতো। বিকাশের মৃত্যু নিশাদের ফ্যামিলিটাকে শেষ করে দিয়েছিল। কিন্তু থেমে থাকে না কোনও কিছুই। ওর বাবা প্যারালাইসিসে পড়ে যাবার পর নিতান্ত বাধ্য হয়ে ওকে নামতে হয় এই পেশায়। ওর সঙ্গে কথা বলে জেনেছি ওর মা এতটাই সাদামাটা যে একলা বাজারঘাট করতেও ভয় পান। আদর করে ওকে মাঝে মাঝেই 'তুই' বলি আমি:

—তোর ভিতর এই জিন কোত্থেকে এল বল তো? এই অ্যাগ্রেসিভনেস?

—হেসো না। আমার রক্তে বিষ আছে। তাই আমি এরকম। তুমিও আসলে একটা বাজারি মেয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবো না আমাকে।

—তোকে একটা আস্ত মানুষ ভাবি আমি। কেবল শরীর নয়।

—বাজে কথা। তোমরা ছেলেরা প্রত্যেকে একরকম। কেবল তুমি একটু বেশি ধূর্ত।

আমার হাসি পেল। আমি জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই সফল নই। না আমি সফল স্বামী। না সফল সাংসারিক মানুষ। আমার ছেলে ঠিকমতো বড় হবে কি না নিশ্চিত নয়। আমি কেবল বর্তমানটুকু নিয়েই ভাবি। যেমন, এখন নিশার শরীরে আমি উঠে আসব, যেভাবে চিতাবাঘ তার শিকারের দিকে যায়। কিন্তু পুরো খেলাটা ঘুরে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। নিশা মাঠের দখল নেবে। কিছু খেলায় হেরে যেতে ভালো লাগে। এবারও লাগবে। বিশেষত আমি যখন নীচে শুয়ে থাকি। আমার উপর উঠে মৈথুন করে ও। হয়তো সত্যিই আমায় আঁকড়ে ধরতে চায় ও। কেবল টাকাপয়সা নয়, ওর কাছে অনেক টাকাওয়ালা লোকজন এসেছে। কারও কাছে ধরা দেয়নি ও। যদিও ও জানে না আমার আসল পরিচয়। বারাসত কলোনি মোড়ে আমার এক বন্ধু থাকে। ওকে রাস্তায় দেখেছিলাম—এমনটাই বলেছি ওকে। ওর দাদার মৃত্যুর পিছনে যে আমার একটা বড় ভূমিকা ছিল, সেটা জানলে কী চোখে দেখবে ও আমাকে?

যেমন, নিশা এখনও জানে না, আজ ভোররাতে, আলো ফোটার আগেই ঘুম ভাঙবে আমার। নিঃশব্দে পোশাক বদলে নেব আমি। ওর নগ্ন শরীরটা তখনও কুঁকড়ে থাকবে গর্ভস্থ ভ্রূণের মতো। আমার একটা আঙুল হাতে ধরে ঘুমোনো স্বভাব ওর। কিন্তু সন্তর্পণে সেই আঙুলটাও ছাড়িয়ে নেব আমি। প্রায় ক্ষিপ্র সরীসৃপের ভঙ্গিতে পুরু কার্পেটের ওপর পা ফেলে এগিয়ে যাব দরজার দিকে। আবারও, বিনা শব্দে দরজার ছিটকিনি খুলব। কেবল পার্স আর গাড়ির চাবি থাকবে আমার সঙ্গে। এমনকী মোবাইলটাও সঙ্গে নেব না, কারণ আমার অরিজিন্যাল নাম্বার এটায় নেই। ঘরের ভিতর ইতস্তত ছড়ানো থাকবে আমার টাওয়েল। ভদকার বোতল। ক্যানভাসের ব্যাগ। যাতে একটু বেলায় ঘুম থেকে ওঠার পরও কিছুক্ষণ ও টের না পায় আমার এই নিঃশব্দে মিলিয়ে যাওয়া। মোটেলের রিসেপশনে যাবতীয় বিল পেমেন্ট করা আছে। দারোয়ানের হাতে গুঁজে দেওয়া আছে একটা বড় নোট। দরজা খোলাতে অসুবিধা হবে না। আমার আসল নাম, পেশা, বাড়ির লোকেশন কোনওটাই বলিনি নিশাকে। আমাকে খুঁজে পাওয়া অবশ্য কঠিন নয়। দীপাংশুদা চেনে আমাকে। তবে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা কঠিন। আমি স্বেচ্ছায় ধরা দিই। স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করি নিজেকে।

গাড়ি স্টার্ট নেবে চকিতে। আলো ফুটতে তখনও কিছুটা দেরি। দ্বিতীয় হুগলি সেতু পেরিয়ে রবীন্দ্রসদনের সামনে পৌঁছোতে মাত্রই আধঘণ্টা লাগবে। আমাকে ফোন করলেও ঘরের ভিতরেই বেজে উঠবে মোবাইল। বার বার।

কয়েক মুহূর্তের ভিতর আর একটা নতুন গল্পের জন্ম হবে হয়তো। ❖

আমার হাসি পেল। আমি জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই সফল নই। না আমি সফল স্বামী। না সফল সাংসারিক মানুষ। আমার ছেলে ঠিকমতো বড় হবে কি না নিশ্চিত নয়। আমি কেবল বর্তমানটুকু নিয়েই ভাবি।

ধূসরনীল সবুজ

ন ন্দি তা আ চা র্য চ ক্র ব র্তী

রুপুর আর কি দোষ! সমাজটাই তো এরকম। মেয়েদের দুর্বল দেখতে ভালোবাসে। রুপুকে দেখাতে হবে মেরি কমকে।

ছয়

মণিপুরের প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র পরিবার থেকে যে মেয়ে উঠে এসেছে বিশ্বের দরবারে।

শ্রীজাতার মনে আছে ছোট বয়সে প্রায়ই সে বাড়ির পাশে 'সবুজ সংঘ' ক্লাবে ঢুকে পড়ত। ওর খেলার সঙ্গীসাথী ছিল কম। আশপাশে বেশ ক'টা খেলা শেখাবার ক্লাব ছিল। ফুটবল ক্রিকেটের সঙ্গে ভলিবল এবং টেবিল টেনিস। ওর পাড়ার তিনজন বান্ধবী টেবিল টেনিস খেলতে যেত। ও-ও বায়না ধরেছিল। বাবা ভর্তি করল না, ওখানে নাকি পরিবেশ ঠিক নেই। তবে ভলিবলটা ওকে বেশি টানত। খোলা মাঠের মধ্যে খেলা। ওখানে তো বাবা দেবেই না। কারণ সেখানে তখন বেশির ভাগ মেয়েরা আসত নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে। তাদের তেমনই লেখাপড়া বা কালচার ছিল না। অথচ শ্রীজাতার মনের মধ্যে তুমুল দামালপানা। অনবরত তার শরীর মন ছুটে বেড়াত, কী করে সে? পাড়ায় যে দু-একটা সঙ্গীসাথী আছে তাদের সঙ্গে আশপাশে বস্তির ছেলে-মেয়েদের জুটিয়ে নিয়ে সবুজ সংঘ ক্লাবের পাশে ছোট্ট মাঠটাতে নেমে পড়ত, চলত ফুটবল, ভলি, ক্রিকেট সবরকম খেলা। আর সুযোগ পেলেই ঢুকে পড়ত 'সবুজ সংঘে'। ওখানে বক্সিং শেখানো হত। ফাঁক পেলেই তার ছোট দু-হাতে বেদম বড় গ্লাভস পরে ঝোলানো স্যাকে দুমদাম ঘুসি মারত, বড়রা দেখলে কখনও হাসত, কখ

শীতকালে নেট টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলা, সঙ্গে ক্রিকেট। আর বর্ষার মরসুমে সুযোগ পেলেই গায়ে জার্সি চাপিয়ে ফুটবল। তবে দিনটা হতে হবে কোনও ছুটির।

নও মৃদু বকুনিও দিত। তবে বড় বকুনিটা খেল বাবার কাছে। পাড়ার কোনও কাকু হয়তো মজা করে কথাটা বাবাকে বলেছিল, তারপরই বাবা ডেকে প্রচণ্ড এক ধমক দেয়, 'এসব কী শুনছি? ছেলেদের ক্লাবে ঢুকে বক্সিং করা! এত ছেড়ে দিচ্ছি, এত খেলছ, তাতেও তোমার দুরন্তপনার শেষ নেই? এখন বড় হচ্ছ। অন্য মেয়েরা যেমন ভদ্র সভ্য হয়ে থাকে, তেমন থাকবে, না হলে বিকেলে বেরোনোই বন্ধ করে দেব।'

সত্যিই কি বন্ধ করা গেছে? তার অফুরন্ত প্রাণ, ছুটে বেড়ানোর তুমুল ইচ্ছে—ভেতরে দাপিয়ে চলেছে এখনও। আর সেই বক্সারের গ্লাভস? ঢুকিয়ে রেখেছে চোরাকুঠুরিতে। ঠিক সময় মতো ওই গ্লাভসে হাত ঢুকিয়ে সে ভেঙে ফেলবে পৃথিবীর সমস্ত প্রতারণার ফাঁপা হাড়।

।। ১১ ।।

ওদের প্রজেক্টের ভেতর প্রচুর জায়গা, তাই ওরা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছে এন্টারটেনমেন্টের রসদ। শীতকালে নেট টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলা, সঙ্গে ক্রিকেট। আর বর্ষার মরসুমে সুযোগ পেলেই গায়ে জার্সি চাপিয়ে ফুটবল। তবে দিনটা হতে হবে কোনও ছুটির। ওরা এক্সট্রাটাইম ওয়ার্কে আসবে। ফুটবলের জন্য আগের দিন থেকেই পরিকল্পনা থাকবে। না হলে ঝপ করে নেবে পড়া যায় না কি?

আজ পনেরোই আগস্ট। তুর্যর ডিউটি রয়েছে। কীই বা করবে আর ছুটি নিয়ে? বরং ছুটিটা জমা থাক। সুযোগ মতো নিয়ে নেবে। কোথাও বেড়াতে গেলে তখন কাজে লাগবে। তা ছাড়া এখন ওর বাড়ি থাকতে ভালোই লাগে না। যবে থেকে ওদের বাড়ি ওই মিস্টার রায় এসে রয়েছে।

সৌম্যই বলল, 'বস কালকে ডিউটি নেবে? তোমার নাম অ্যালোট করা হচ্ছে, কোথাও যাওয়ার প্ল্যান নেই তো? দেখি স তোর গার্লফ্রেন্ড না রেগে যায়।'

—'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কোনও অসুবিধা নেই, তুই আছিস কি?'

—'আছি তো, কাল ফুটবল টুর্নামেন্টেরও আয়োজন হচ্ছে। এই তুই খেলার ড্রেস আনতে ভুলবি না। ইলেকট্রিকালের বিশ্বাসদা সব আয়োজন করছে। কালকে লাঞ্চও স্পেশাল।'

'ড্রিংকস থাকবে নাকি?' তুর্য বলল।

—'শালা, মারব পেছনে এক লাথি। স্বাধীনতা দিবসের লাঞ্চে ড্রিঙ্কস!' সৌম্য আলতো করে পিঠে ঘুঁষি মারে। তারপর বলে, ' তুর্য। প্লিজ, ড্রিঙ্ক করাটা একটু কমা, তোর সত্যিই কী হয়েছে আমাকে বলবি?'

তুর্য টেবিল বাজায়। 'আচ্ছা জয়সোয়াল। ও থাকছে নাকি?'

জয়সোয়াল লোকটা অ্যাকাউন্টসের অল ইন অল। তুর্যকে এই ডিপার্টমেন্টেরও কিছুটা কাজ সামলাতে হয়। আর এই করতে গিয়েই ক্ল্যাশ। অ্যাকাউন্টসে প্রচুর কারচুপি। জয়সোয়াল টাকা খেয়ে টেন্ডার পাইয়ে দিচ্ছে। তুর্য যবে থেকে আঁচ করতে পেরেছে, তবে থেকে লোকটা ওর পেছনে লেগেছে। আচ্ছা, আরও যে দু'একজন রয়েছে, তারা কি বুঝতে পারে না? নাকি ঘুষের টাকার ছিটেফোঁটা ওরাও পায়? প্রথমে জয়সোয়াল ওর ওপর রেগে গেলেও, পরে দলে টানতে চেয়েছিল। কত টাকা পায়? কী কাইন্ডস পায় ওরা? পঁচিশ বছর বয়সেই সে ছুড়ে দেওয়া অপমানকর এ সব অর্থ খুঁটে নেবে! উঞ্ছবৃত্তি করবে! শ্রীজাতা জানলে...আবার শ্রীজাতা এল কোথা থেকে! যাক গে... নাহ্, এক্ষুনি সে পিঠ কুঁজো করে চলতে পারবে না।

আজ সকালবেলা যখন বেরোচ্ছে মিস্টার রায় হঠ করে

সামনে এসে পড়ে।—'এ কী, তোমার আজও অফিস নাকি?' তুর্য কোনও উত্তর দেয় না। জানে দেবে না। তবু লোকটা ছুতোনাতায় ওর সঙ্গে কথা বলবেই। আজ আবার ওই সময়টা মা-ও সামনে এসে দাঁড়ায়। মায়ের ওপরও ওর রাগ হয়ে যায়। কেন মা এই লোকটাকে এখনও পাত্তা দিচ্ছে! তুর্য বড় হয়ে গেছে, যেমনই হোক, একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। কোনও কারণে এ চাকরিটা ছেড়ে দিলেও আবার একটা হয়ে যাবে। বেকার সে থাকবে না। মায়েরও সরকারি চাকরি, মিঃ রায় যখন ওদের ছেড়ে চলে গেল, তখন মা কিছু করত না। শুধু গান করত, অবশ্য মা তার আগে থেকেই চাকরির চেষ্টা চালাচ্ছে।

মা আর মিস্টার রায়ের লাভ ম্যারেজ। সুব্রত রায়ের গানেতেই মুগ্ধ হয়ে মা প্রেমে পড়েছিল। তখন ওই লোকটির বোহেমিয়ানিজম মায়ের কাছে রোমান্টিক লাগত। তার উদাসীনতাকে পৌরুষ বলে মনে হত। বিয়ের পর মা আস্তে আস্তে বাস্তবটাকে বুঝতে পারে। তারপর ছোট্ট ছেলে আর স্ত্রীকে পেলে লোকটা যখন বম্বে চলে গেল, সুরকার হবে বলে, তখন মায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

বেশ ভালো চাকরি করত সুব্রত রায়। একটা বিদেশি কোম্পানিতে। শিল্পী বলে সেখানেও তাকে সবাই সম্মান করত। কাজ না থাকলেও যখন তখন লোকটা যেখানে সেখানে চলে যেত। তবু কোম্পানি কিছু বলত না। তারপর সত্যিই একদিন মুম্বইতে একটা হিন্দি ফিল্মে মিউজিক তৈরির সুযোগ এল। দিনের পর দিন মুম্বইতেই পড়ে রইল। নিজেই চাকরি ছেড়ে দিল। অফিস কিন্তু ওকে ছাড়তে চায়নি। বউ-বাচ্চার কথাও ভাবল না।

তখনই উঠে পড়ে নিজের চাকরির চেষ্টা-করে তুর্যর মা। রেলে চাকরি পায়। আজ থেকে তেইশ চব্বিশ বছর আগে সরকারি চাকরিতে তেমন মাইনেও ছিল না। ছোট্ট তুর্যকে কোথায় রাখবে, কী করবে... দিদু মামার বাড়ি নিয়ে গেল। সেই থেকে কখনও দাদু-দিদু কখনও আবার মাসির বাড়ি থেকে বড় হওয়া, স্কুলে পড়াশোনা করা। আর ছুটি পড়লেই মা চলে যেত অথবা দিদু তাকে নিয়ে কলকাতার বাড়িতে চলে আসত।

অন্যদিকে সুব্রত রায় তখন গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে ঘুরপাক খাচ্ছে, কখনও হাতে প্রচুর পয়সা, কখনও কিছু নেই। তবে বেশি টাকা-পয়সা যখন হাতে আসত, মা কিছু বুঝতে পারত না। ওখানের বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যেই লোকটা তা উড়িয়ে দিত। মা চাকরি পাবার আগে সামান্য কিছু পাঠাত। চাকরি পাওয়ার পর সব বন্ধ। দিনের পর দিন কলকাতাতেও আসত না। মাকেও যেতে বলত না। আসলে তখনই লোকটা সঙ্গিনী নিয়ে লিভ ইন করা শুরু করে দিয়েছে। একবার মনে আছে মা জোর করে মুম্বইতে চলে গেছিল। মামা নিয়ে গেছিল। তুর্য তখন পাঁচ বছরের। ঠিকঠাক অ্যাড্রেসও দিত না লোকটা। খুঁজতে খুঁজতে দু'দিন বাদে মা নির্দিষ্ট সেই ফ্ল্যাটে পৌঁছেছিল। সারা দুপুর, বিকেল, সন্ধে একরকম রাস্তার ওপর কাটিয়ে রাত্রে সুব্রত রায়ের সেই সঙ্গিনীকে ফিরতে দেখল ওরা। আর গভীর রাতে ফিরল সুব্রত রায়।

ফ্ল্যাটের সিকিউরিটির পাশে বসেছিল মা। লোকটা ফিরতেই তুর্যর হাত ধরে সেই বাড়ির দরজায় হাজির হয়। এখনকার মতো জোরদার মিডিয়া যদি তখন থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই টিভিতে, নিউজ পেপারে খবর হয়ে যেত,—উঠতি মিউজিশিয়ানের স্ত্রী, তার শিশুপুত্রের হাত ধরে স্বামীর লিভ ইন-এর সংসারে হাজির!

সেদিনের সেই দৃশ্য আজও তুর্য ভুলতে পারেনি। কখনও বাস্তব চেতনায়, কখনও দুঃস্বপ্নের জগতে হানা দেয়।

আজ দারুণ খেলা হল। দু'দলই সমান টক্কর দিচ্ছিল, হাফ টাইমের অনেক পর অবধিও দু-পক্ষের কেউ গোল করতে পারেনি। শেষকালে পাঁচ মিনিট সময় থাকতে একমাত্র গোলটা দিল তুর্য। ব্যাস, ওর দল জিতে গেল! এবার বিশ্বাসদাকে ধরা হয়েছে। জিতেছে যখন, প্রাইজ দিতেই হবে।

বিশ্বাস সকাল থেকে ছোটাছুটি করছে। একদিকে লাঞ্চের ব্যবস্থা অন্যদিকে ফুটবল টুর্নামেন্ট। আবার সামান্য অফিসিয়াল কাজ-কম্মও চলছে। কাজ না থাকলে আর কোম্পানি খামোকা কেন এতগুলো লোককে ছুটির দিকে আটকে রাখবে। কেনই বা পয়সা খরচ করে এলাহি খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করবে? কিন্তু খেলার পর প্রাইজ দেওয়ার জন্য কোনও কিছু রেকমেন্ড করেনি।

তবে ওরা ছাড়বে না। কত কষ্ট করে জিতেছে না! হেরো দলের সঙ্গে স্ট্যাটাসে ওদের কোনও তফাত থাকবে না? কোম্পানি কিছু দেয়নি তো কী হল? বিশ্বাসদা দেবে। চল্লিশোর্ধ বিশ্বাস মাথা চুলকোয়। সকাল থেকে নানা ঝামেলায় খেলতে পর্যন্ত নামতে পারেনি। এখন এতগুলো বাচ্চা বাচ্চা দামাল ছেলেকে সামলায় কী করে? শেষকালে রফা হল—ঠিক আছে, জেতা দলের জন্য এখানকার বিখ্যাত দিলখুশ পান আনা হবে। আর সেটা পে করবে বিশ্বাস।

তুর্য বায়না ধরে। তার কী হবে? সে যে এক গোল দিয়ে দলকে জিতিয়েছে, ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছে—তাকে কী দেওয়া হবে। বিশ্বাসদা বলে, 'তোর জন্য দুটো এক্সট্রা রাজভোগ রাখব। খেতে না পারলে বাড়িতে প্যাক করে দিয়ে দেব। যা এবার গায়ের ধুলোবালি ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আয়। চায়ের সঙ্গে দারুণ চিকেন পকৌরা হচ্ছে।'

সারাদিন মজা করেই কাটল। আজ ছুটিও হল তাড়াতাড়ি। সবে ছ'টা বাজে। সৌম্য ফোনে ব্যস্ত। ওর গার্ল ফ্রেন্ড অপেক্ষা করছে। তুর্য এখন কী করবে? কোথায় যাবে? বাড়িতে গিয়ে পড়তে বসবে? পড়ার ইচ্ছেটা একেবারে চলে গেছে। অথচ তার ম্যানেজমেন্ট কোর্সের আবার একটা সেমেস্টার এসে গেছে। কী হবে কে জানে। মা চাপ দিচ্ছে সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসবার জন্য, ও এই চাকরিটা করুক, মা একেবারেই চায়নি। রাইস বা ও রকম কোনও একটা সংস্থায় ভর্তি হয়ে W.B.C.S-এর জন্য তৈরি হোক। সঙ্গে সরকারি চাকরির পরীক্ষাগুলোও দিক—এরকম ইচ্ছে ছিল মা'য়ের। অঙ্ক ভালো লাগত না বলে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জন্যও চেষ্টা করতে পারেনি। অথচ আর্টস সাবজেক্টেও যে ও একটা দারুণ ভালো রেজাল্ট করছে, তা-ও নয়। আসলে পড়াশোনাটাই তেমনভাবে করত না। ছোটবেলা থেকে মা-বাবা ছাড়া বলে দাদু-দিদু বেশি আদর দিত। আবার নিঃসন্তান মাসি-মেসোর কাছে যখন থাকতে এল, তারাও অতি আদর দিতে শুরু করে। আর তাতেই তুর্য

তখনই উঠে পড়ে নিজের চাকরির চেষ্টা করে তুর্যর মা। রেলে চাকরি পায়। আজ থেকে তেইশ চব্বিশ বছর আগে সরকারি চাকরিতে তেমন মাইনেও ছিল না।

খিলখিল করে একটা মেয়ের গলায় হাসি। আদিত্য প্রাণপণে সাঁতরে পাড়ে আসতে চায়। কে হাসে? সে চোখ টান করে দেখবার চেষ্টা করে। আরে, ঘাটের ধারে চুমকি দাঁড়িয়ে আছে না?

একটি বাঁদর তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ সত্যিই তার নিজেকে এখন একটা অপদার্থ মনে হয়। অঙ্ক বেশ ভালো বুঝত। কিন্তু করতে ইচ্ছে করত না। শিক্ষকরা তাকে মেধাবী-ই মনে করত। ইলেভেন টুয়েলভে যখন সব থেকে চেপে পড়ার সময়, ঠিক তখনই সে উর্বীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। উর্বীর জন্যই সে তাড়াতাড়ি চাকরি নেয়। অথচ সে-ও তাকে ছেড়ে চলে গেল। আসলে তুর্যই একটা অপয়া, তার জন্মের পরই মা-কে ছেড়ে চলে গেল সুব্রত রায়। তুর্য এটা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না—মামা, মেসো, দাদু যে যতই তাকে ভালোবাসুক না কেন, বাবার অভাব সে সব সময়ই ফিল করত। মা'কে যখনই পেত, জাপ্টে ধরত। মা চলে গেলে সে বিষণ্ণ হয়ে যেত। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত।

আরও একটা ব্যাপার-তার বাবা যে একজন বড় শিল্পী, এটা মনে মনে ভাবতে তুর্যর ভালো লাগে। অথচ লোকটার উশৃঙ্খলতা আর দায়িত্বজ্ঞানহীন নিষ্ঠুরতা—তার ভেতরে ভেতরে একটা দারুণ ঘৃণার জন্ম দিয়েছিল। তুর্য বেশ বুঝতে পারে এসব বোধগুলোই তাকে ঠিকমতো ব্যক্তিত্ব তৈরি হতে বাধা দিয়েছে। অথচ এই প্রতিকূলতা আগুন হয়ে উত্তাপ সৃষ্টি করে, তাকে সামনে এগিয়ে যেতে ইনসপায়ার করতে পারত? তা না করে শুধু জ্বালিয়ে দিয়েছে!

উর্বী যে তার কাছ থেকে চলে গেছে, এর জন্য সে উর্বীকে দোষ দেয় না। কাছের মানুষগুলোকে তুর্য বড় পীড়ন করে। অত্যধিক পসেসিভ হয়ে পড়ে। অথচ সে কি তাদের প্রতি ততখানি ডিভোটেড থাকে? একেবারেই নয়! মা—তার মা যে সারা জীবনটা তার জন্য একা লড়াই করে গেল, তার জন্য সে কতটা ভাবে? মা'য়ের কথা ভেবেও তো ভালো করে পড়াশোনা করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা উচিত ছিল!

উর্বীর জন্যই কি সে বিএসসি পরীক্ষা দিয়ে চাকরিতে ঢুকল? আসলে এ সবই তার নিজের জন্য। জন্মদাতার উদ্দাম জীবন উপভোগের বীজ তার মধ্যে রয়ে গেছে। কত ছোট থেকেই নেশাখোর হয়ে উঠেছে! নেশার টাকা আর ডেটিং-এ যাওয়ার টাকা জোগানোর জনই সে ঝট করে চাকরি নিয়ে নেয়। শুধু উর্বী নয়, সে সময় লুকিয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গেও সে ডেট করেছে। অথচ উর্বী তাকে কত বিশ্বাস করত, কত ভালোবাসত! সেও তো ভালোবাসত! তবু সে অন্য মেয়েদের শরীর চেয়েছে। আসলে ওই যে জিন, সুব্রত রায়ের! বাবা হিসেবে স্বীকার না করলেও—লোকটার সুর, ভেতরকার ছটফটানি আর হীন বিশ্বাসঘাতকতা; সবটাই রয়ে গেছে তুর্যর মধ্যে। তবে ওপরে ওঠার নেশাটা তাকে দেয়নি লোকটা। ওটা পেলে বরং ভালো হত।

।। ১২।।

আদিত্যর দম বন্ধ হয়ে আসে। পুকুরের মধ্যে সমুদ্রের মতো ঢেউ ভাঙছে কী করে? এ পুকুর, আধডাঙা এ ঘাটলা—এ সবই তো তার আজন্ম চেনা। অথচ এরাই আজ এমন শত্রুতা করছে? রিন্টুটাও হাত ফসকে গেল। এমনটা হোক, তাও তো আদিত্য চায়নি। রিন্টুকে শুধু একটু ভড়কি দিতে চেয়েছিল। আদিত্যর বান্ধবীর সঙ্গে এত গা মাখামাখি? অথচ কতদিন ধরে আদিত্যর সঙ্গে সম্পর্ক, ও কোনওদিন মেয়েটার চুলের ডগাটাও ছুঁতে পারল না। আর স্পষ্ট দেখল রিন্টু মেয়েটার হাত ধরে হাঁটছে, সেই থেকে ওর বুকে ব্যথা। রীতিমতো অপমানও লাগছে।

রিন্টু কি ডুবে গেল? ও তো ভালো সাঁতার জানে না। সে জন্যই তো আদিত্য ওকে প্ল্যান করে পুকুরে নামিয়েছে। একটু হাবুডুবু খাইয়ে তারপর তুলে দেবে এমন ভেবে রেখেছিল, এতে করে যদি তার মনের জ্বালা খানিক জুড়োয়, কিন্তু যদি তার মনের জ্বালা খানিক জুড়োয়, কিন্তু কেস তো পুরো ঘেঁটে একসা। এই জলের তোড়ে আদিত্য নিজেকেই ঠিক রাখতে পারছে না, তো রিন্টুকে বাঁচাবে কি করে? আবার একটা ঢেউ এসে ঝাপটা মারে। নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে জল ঢুকে একেবারে শ্বাসনালি বন্ধ হয়ে যায়। কোনওক্রমে সে ভেসে থাকার চেষ্টা করে। শালা, আজ যদি পুকুর থেকে একবার উঠতে পারে, আর জীবনে কোনও দিন জলে নামবে না। তবে রিন্টু যদি ডুবে মরে এবং কোনওভাবে যদি প্রমাণ হয়—আদিত্যই ওকে জলে নামিয়ে গভীরে ঠেলে দিয়েছে; তাহলে আদিত্যরও রেহাই নেই। কী হবে তখন? পুলিশ ওকে জেলে নিয়ে যাবে? চাকরিটাও তখন খোয়াতে হবে!

খিলখিল করে একটা মেয়ের গলায় হাসি। আদিত্য প্রাণপণে সাঁতরে পাড়ে আসতে চায়। কে হাসে? সে চোখ টান করে দেখবার চেষ্টা করে। আরে, ঘাটের ধারে চুমকি দাঁড়িয়ে আছে না? পাশের ওই বাচ্চাটা কে? টুনাই? তার নিজের ছেলে, অথচ সে চিনতে পারছে না! কতদিন দেখেনি সে ছেলেকে? মা-ছেলে দু'জনেই আঙুল তুলে ওকে দেখাচ্ছে আর হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

টুনাই হওয়ার পর চুমকি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। শহর কলকাতার একক সংসারে সব দিক সামাল দিয়ে চলতে হত আদিত্যকে। রাতের পর রাত জেগে সে ছেলের ন্যাপি পাল্টেছে, বোতলে করে দুধ খাইয়েছে, দু'হাতের মধ্যে ছোট্ট শিশুটাকে নিয়ে পায়চারি করে ঘুম পাড়িয়েছে। সেই ছেলে...

আর চুমকি? তার জন্যই বা কম কী করেছে? দিনের পর দিন চেপে পড়িয়েছে, এখান ওখান দৌড়ে নোট জোগাড় করে এনেছে, তবে না স্কুল সার্ভিস দিয়ে চাকরিটা পেয়েছে! বিশ্বাসঘাতিনী, আজ সব ভুলে গেলি? ছেলেটাকেও আমার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলা?

চুমকি হাসতে হাসতেই ওকে চিৎকার করে ডাকে।—'আমি বিশ্বাসঘাতিনী না তুমি? দিনের পর দিন বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো। নতুন নতুন বন্ধু জুটিয়ে মদের ঠেকে বসে পড়া। এসব কোনও ভদ্র সভ্য মেয়ে টলারেট করবে? তোমার জন্য কি না করেছি! কলকাতার মেয়ে। জীবনে কখনও গ্রামই দেখিনি। সেই আমি তোমার গ্রামের বাড়িতে শাড়ি পরে, লক্ষ্মী বউমা হয়ে কতদিন কাটিয়েছি।' চুমকি আবার হাসতে থাকে। হিঃ হিঃ হিঃ।

জলের চাপটা এখন কম আছে। জলের ওপর ভেসে থাকতে থাকতে আদিত্য বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। চুমকি ওদের এই গ্রামের বাড়িতে এল কী করে? পাশে আবার লম্বা মতো একজন পুরুষ। মুখটা কেমন অস্পষ্ট। এ কী চুমকির নতুন সঙ্গী? চুমকি কি ওকে বিয়ে করবে মনস্থ করেছে না

বিয়ে করে ফেলেছে? এ বাবা, আদিত্য কিছুই জানে না! তাহলে কি টুনাই, আদিত্যর ছেলে, তাকেও ওই পুরুষটি নিয়ে নেবে? এমন হলে আদিত্য ফের কোর্টে যাবে। টুনাইয়ের প্রতি সব অধিকার সে ছেড়ে দিতে পারবে না।

চুমকি আবার কী যেন বলছে, 'হেই, আদিত্য, কী ভাবছ? তোমার গ্রামে আবার কেন আমি? আরে তোমার ছোট বয়সের বন্ধু রিন্টু, দেখছ না আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, ওই আমাকে নিয়ে এসেছে। ভয় পেও না, আমি ওকে বিয়ে করার কথা ভাবছি না। ওর তো গার্লফ্রেন্ড আছে। তোমার সেই বান্ধবী! আর এক বিয়েতেই আমার যা বিশ্বদর্শন হয়েছে, আর বিয়েতে আকাঙ্ক্ষা নেই। তুমি যেমন আমাকে লুকিয়ে সুযোগ পেলেই আমার বান্ধবীদের সঙ্গে ফ্লার্ট করতে, আমি কিন্তু তা করছি না। আচ্ছা রিন্টুকে তুমি কেন ওকে জলে হাবুডুবু খাওয়াবার প্ল্যান আঁটছিলে? বেশ হয়েছে, এখন নিজের জালে নিজেই হাবুডুব খাচ্ছ।'

কী আশ্চর্য! ওটা রিন্টু? কী করে গেল ওখানে? গা-মাথা তো একটুও ভিজে নয়! তাহলে কাকে ও জলে চোবাচ্ছিল? আর মনে মনে আদিত্য যা কিছু ভাবছে—সবটাই কি করে চুমকি শুনতে পাচ্ছে? এসব কী হচ্ছে, কে জানে। আদিত্য নির্ঘাত স্বপ্ন দেখছে। বড্ড বড় আর বিচ্ছিরি এক স্বপ্ন। এরই মধ্যে আবার সেই মেয়েটা এসে দাঁড়িয়েছে। নামটাও এ মুহূর্তে মনে আসছে না। হাতিবাগানের ওদিকে থাকত। আদিত্য ওকে অনার্সের দুটো পেপার পড়াতে যেত। ইংলিশ অনার্স ছিল। মেয়েটা পড়াশোনায় তেমন শার্প চিল না। বাইরে এক জায়গায় পড়ত। তা সত্ত্বেও বাড়িতে আবার আদিত্যকে পড়াতে যেতে হত। মেয়েটার ফিগারটা খুব সুন্দর ছিল। আদিত্য যে সেই ছাত্রীর সঙ্গে একটু ধান্দা করার চেষ্টা করেনি, তা নয়। তবে সেটা খুব মাইল্ড ছিল। শেষ পর্যন্ত টিউশনটা তার থাকেওনি। হঠাৎ এতদিন বাদে সেই মেয়েটা রাগী চোখে এসে দাঁড়াল কেন? স্বপ্নটার যেন কোনও মাথা মুণ্ডু নেই। একটা থেকে আর একটা...।

এই বাড়িটার সব থেকে ভালো লাগে বাথরুমটা অনেকটা বড়। বাড়িওয়ালার ছেলে এই পুরোনো বাথরুমটাতেই হালকা নীল টাইলস আর মার্বেল বসিয়ে চেহারা পাল্টে দিয়েছে। প্রমাণ সাইজ জানলার ওপরে সবুজ গাছ। আদিত্য সেখানে আবার একটা বনসাই এনে রেখেছে। একদিকে লম্বা বাথটব। বাথটবের উল্টোদিকে ডিম্বাকৃতি বিশাল আয়না। আয়নার চারদিকটা পেতলের কারুকাজ করা ফ্রেমিং। বাড়িওয়ালার ছেলে এই মিররটা শখ করে অকশান থেকে কিনে এনেছিল।

কলকাতার ওপরে ভাড়াবাড়িতে এরকম বাথরুম, ভাবা যায় না। আসলে এত ভাড়াটের জন্য নয়। ছেলেটি হঠাৎ চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে যায়। বাবা মা একা হয়ে পড়ে। একজন শক্ত সমর্থ যুবক পুরুষ, পরিবার নেই, ঝুট ঝামেলা নেই; আপদে বিপদে পাশে দাঁড়াতে পারবে—আদিত্যকে বয়স্ক বাড়িওলা কাকু কাকিমার খুব পছন্দ হয়ে যায়।

চুমকি চলে যাওয়ার পর আদিত্য পুরোনো বাড়িটা ছেড়ে দেয়। সারা বাড়িতে চুমকি আর টুনাইয়ের শূন্যতা হাহাকার করত। আদিত্য টিকতে পারছিল না। মাঝখানে বছর দেড়েক একটা সেপারেট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে ছিল। তখন প্রায়ই তার বাড়িতে হুল্লোড় পার্টি হত। একা থাকে, বউ-বাচ্চার ঝামেলা

চুমকি আবার কী যেন বলছে, 'হেই, আদিত্য, কী ভাবছ? তোমার গ্রামে আবার কেন আমি? আরে তোমার ছোট বয়সের বন্ধু রিন্টু, দেখছ না আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, ওই আমাকে নিয়ে এসেছে।

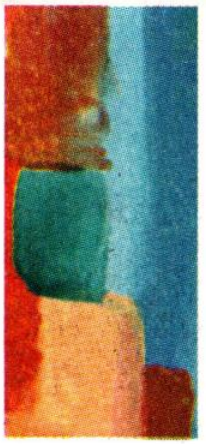

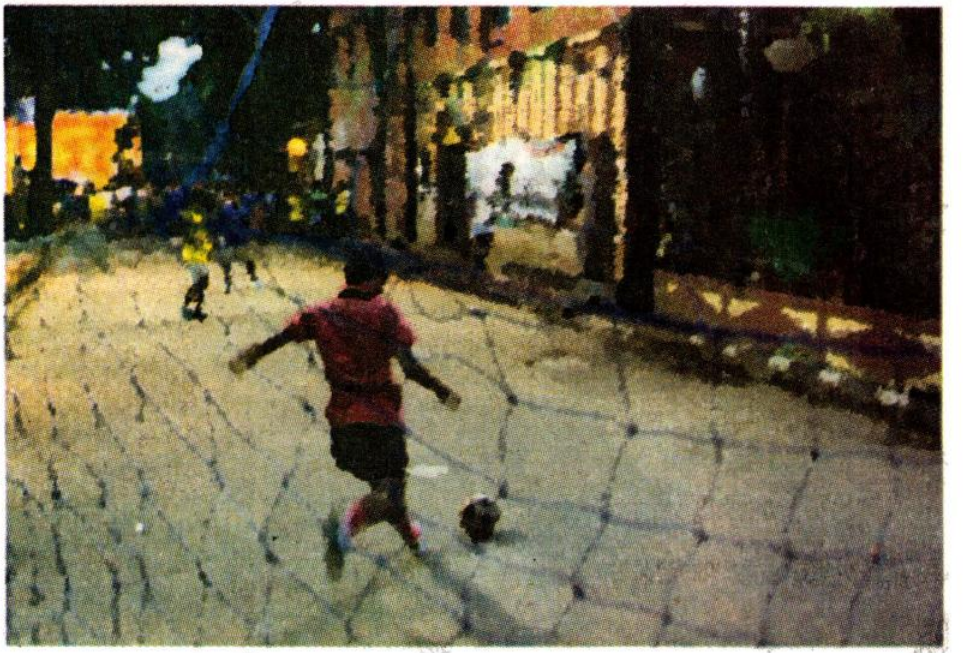

কিন্তু রিন্টু আর চুমকিই বা কেন? তার স্বপ্নে? ক্লাস টেনে পড়ার সময় ক্লাসের এক সহপাঠিনীকে ঘিরে তার আর রিন্টুর মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। সে তো কবেকার ঘটনা!

নেই। অতএব মদ খেতে হলে চল আদিত্যর বাড়ি। সে-ই বা কী করে? এ সব বন্ধুদের ছাড়া তো তার চলেও না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে জ্বলন ধরে যেত। শালা, নিজেদের সব ঠিক রেখে তার বাড়িতে এসে যা খুশি করা! কারণ সে একা থাকে। ইচ্ছে করে নয়। বউই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। তাই একদিন হুট করে সিদ্ধান্ত নিল বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে এমন জায়গায় ভাড়া নেবে যেখানে যখন তখন বন্ধুরা এসে আড্ডা জমাতে পারবে না।

তার ভাগ্য ভালো। হুট করেই এই বাড়িটার খোঁজ পেয়ে যায় চেনাজানার মাধ্যমে। দোতলা বাড়ির এক সাইডে এই সুন্দর বাথরুম সংলগ্ন খোলামেলা একটা ঘর, এক টুকরো ডাইনিং স্পেস আর ছোট্ট এক ঝোলা বারান্দা। সেখান দাঁড়ালে অনেকটা আকাশ দেখা যায়। আর কী চাই? ভাড়া অবশ্য একটু বেশিই মনে হল। তা হোক। এখান থেকে তার কর্মস্থানও কাছে। এ বাড়িটার একটাই অসুবিধা, কোনও কিচেন নেই। ডাইনিং এর একদিকেই সে টেবিল পেতে কিচেন বানিয়ে নিয়েছে, টেবিলটা অবশ্য তার নয়। বাড়িওয়ালা কাকিমার। তিনিই দিয়েছেন।

তবে এই বাথরুমটায় ঢুকলে একদিকে যেমন আদিত্যর ভালো লাগে, তেমন মন খারাপও করে। এরকম বাথটাবে একা চান করতে মন চায়? আহা, যদি মনের মতো একজন সঙ্গিনী থাকত! শিশুর মতো আদর যত্নে সে তাকে চান করিয়ে দিত।

জল ভরে উঠেছে। জলের ভেতর হাত ডুবিয়ে পা ঝুলিয়ে সে বসে থাকে, ছোট বয়সে মা বলত, 'ভয়ের কথা, বাজে স্বপ্নের কথা জলের কাছে বলবি। দেখবি সব কিছু কেটে যাবে,' সদ্য দেখা ওই বিচ্ছিরি স্বপ্নটার কথা সে বলবে এখন?

ভায়োলিন বেজে ওঠে, ফোনটা জানলার ওপর টবের পাশে রাখা, আদিত্য উঠে গিয়ে ফোন নামিয়ে আনে। তূর্য? আদিত্যর বুকের ভেতর ধড়াস করে ওঠে, কী কোয়েনসিডেন্স! সে আসলে তূর্যকেই ভাবছিল, চেতনে এবং অবচেতনে। দমবন্ধ করে সে দিতে চেয়েছিল তূর্যকেই। কেন না তার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষার ধন ছিনিয়ে নিয়েছে এই উটকো ছেলেটা। অথচ এমন কথা স্বীকার করতে তার পৌরুষে বেঁধেছে।

কিন্তু রিন্টু আর চুমকিই বা কেন তার স্বপ্নে? ক্লাস টেনে পড়ার সময় ক্লাসের এক সহপাঠিনীকে ঘিরে তার আর রিন্টুর মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। সে তো কবেকার ঘটনা! লাস্ট দশ বছরে রিন্টুর সঙ্গে তার দেখাও হয়নি। তবে চুমকির চলে যাওয়াটা দিনে দিনেই তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

'আদিত্যদা, আজ আমি তোমার বাড়ি যেতে পারছি না। একটা অন্য কাজ পড়ে গেছে।' —তূর্য বলে।—'আসবি না? আমি তোর জন্য একটা স্পেশাল চিকেন রান্না করব ভাবছিলাম।'—আদিত্যর এক হাত জলে ডোবানো, অন্য হাতে মোবাইল চেপে ধরা। এখন তূর্য কোথায় যায় বা না যায়, সে বিষয়ে আদিত্যর আর কৌতূহল নেই। কারণ চুমকির মতো শ্রীজাতাও চলে গেছে। তূর্য আর কখনও ওর হাত ধরে ঘুরতে পারবে না। আদিত্য জলে নেমে পড়ে। বারমুডাটা খোলা হল না। থাক। একা একা চান করতে নেমে আর প্যান্ট খোলা না খোলা নিয়ে ভেবে কী হবে।

সে টাবের ভেতর শরীর ছড়িয়ে দিতে থাকে। চোখ বোজা। মনে মনে তার সঙ্গিনী কল্পনা করে নেয়। স্বচ্ছ জলের মতোই টলটলে চোখ সেই মেয়ের। অজস্র চুল ঢেকে দিচ্ছে তার নগ্নতা। তার মাখন রঙের বাহু আর ভারি স্তন লাজুকভাবে স্পর্শ করে আছে আদিত্যর শরীর। ❖ (ক্রমশ)

উদাসী বাবার আখড়া

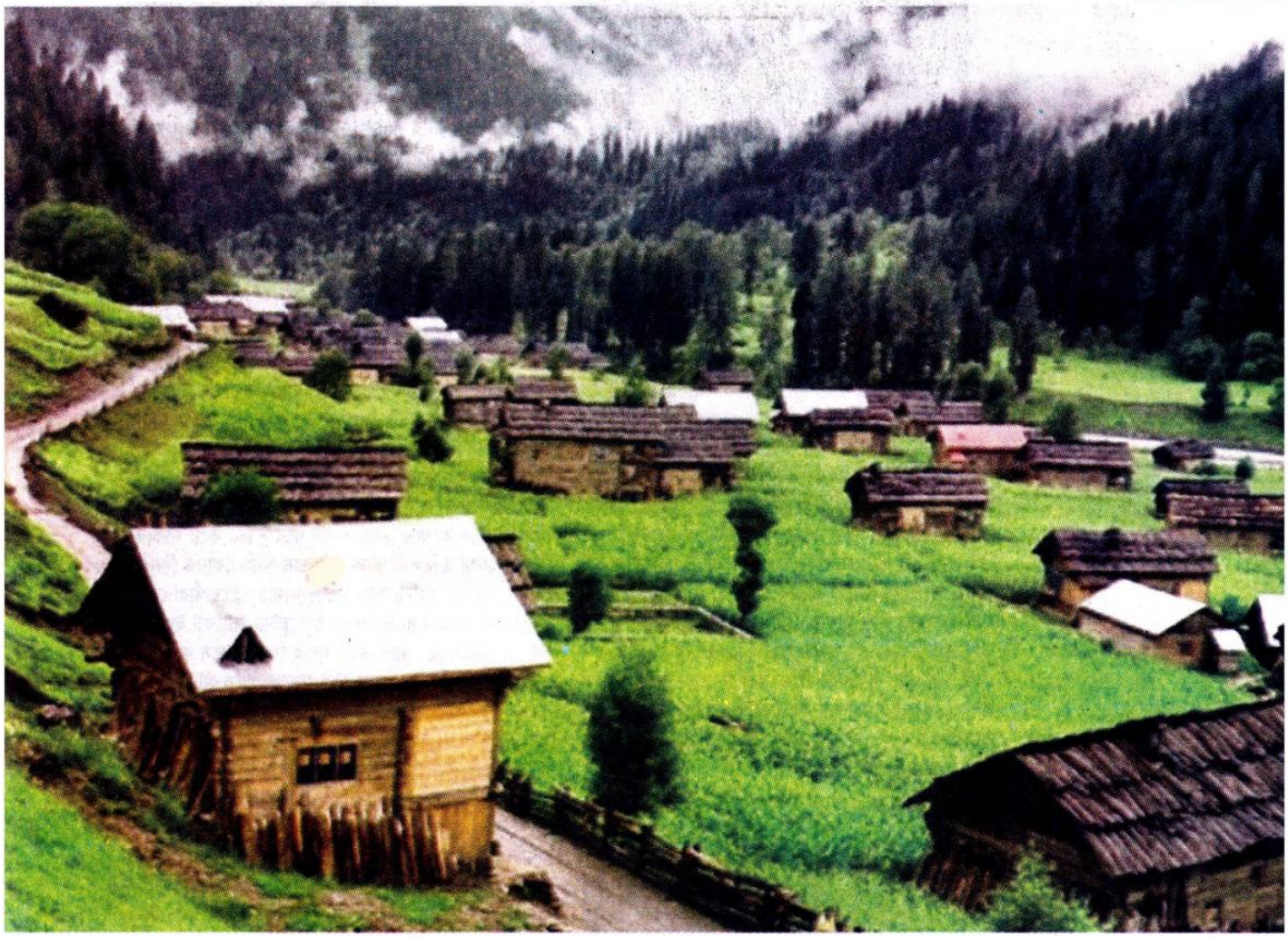

শীত হলুদের কাশ্মীর

ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

ঠিক বেড়াতে যাওয়া যাকে বলে তা আমার অদ্যবধি হয়ে উঠল না। অথচ ভারতবর্ষের এমন কোনও রাজ্য নেই যে যাইনি। এ জেলা থেকে সে জেলা ঘুরে বেড়িয়েছি—দিন-রাত কাবার হয়ে গেছে কাজের চাপে। বিদেশেও গেছি—কিন্তু ওই যে কাজ, সে পিছু ছাড়েনি।

উদাসী বাবার আখড়া

এদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে বাইরে। তার সঙ্গে কনকনে হাওয়া বইছে শব্দ করে। ফলে ঘরের মধ্যে থাকাই শ্রেয়। এ ধরনের শুটিং-এ গেলে আমি যে ঘরে থাকি সেখানেই সান্ধ্যকালীন আড্ডা বসে।

কোথাও একটা পৌঁছোলাম, কাজ করলাম। তো চলো, তল্পিতল্পা গুটিয়ে এবার ফেরার পালা। ফলে একটু যে ঘুরব, দেখব, তা আর হয়ে ওঠেনি। কাজের মধ্যেই যা দেখা, কাজের মধ্যেই যা বোঝা, তাতেই নিজেকে বেঁধে রাখতে হয়েছে। আমার ভবঘুরে জীবনে তাই যেখানেই গেছি, কোনও না কোনও ভাবে কাজ একটা থেকেই গেছে। সে কারণে মনে হয় রাহুল সংকৃত্যায়নের 'ভবঘুরে শাস্ত্র' পড়ে কম বয়সে উত্তেজিত হলেও, এই মাঝ বয়সে মনে হচ্ছে এ জীবনে রাহুলজী কথিত তৃতীয় শ্রেণির ভবঘুরে হওয়াও আমার পক্ষে হয়ে ওঠা সম্ভব হল না। তা হল না তো হল না। তথাপি ঘুরে যে বেড়িয়েছি তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। তাই সেই কাজ করা, লোক দেখা আর নতুন নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখলে কিই বা এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে!

আজ লিখব কাশ্মীর ভ্রমণ নিয়ে। একটা ছোট্ট ইউনিট নিয়ে পৌঁছে গেছি শ্রীনগর। সেখান থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে আমাদের রাত কাটাতে হবে। পরের দিন কাজ করতে হবে সকাল থেকে। কী কাজ তা নিয়ে একটু বলে নেওয়া যাক। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যখন প্রথম ঢুকেছি তখন দাদারা শিখিয়েছিলেন যে 'ফ্রেম করার সময় চেষ্টা করিস ওভারহেড ওই বিদ্যুতের তারগুলো না রাখতে।' কেউ বুঝিয়েছে এই তারগুলো প্রকৃতির মধ্যে কাঁটা হয়ে আছে, এ এক মহাজঞ্জাল। ফলে সে সব কথা মাথায় গেঁথে গিয়েছে। কিন্তু এবারের কাশ্মীর শুটিং-এ ওই ওভারহেড তারের ছবি তোলাই মূল কাজ। কাজটা পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন নামে ভারত সরকারের একটি সংস্থার কর্পোরেট ছবি তোলা। ফলে যে তার এত দিন বাদ দিয়েছি আজ সেই চিত্রবিচিত্র তারই হবে মূল ফ্রেমের উপপাদ্য।

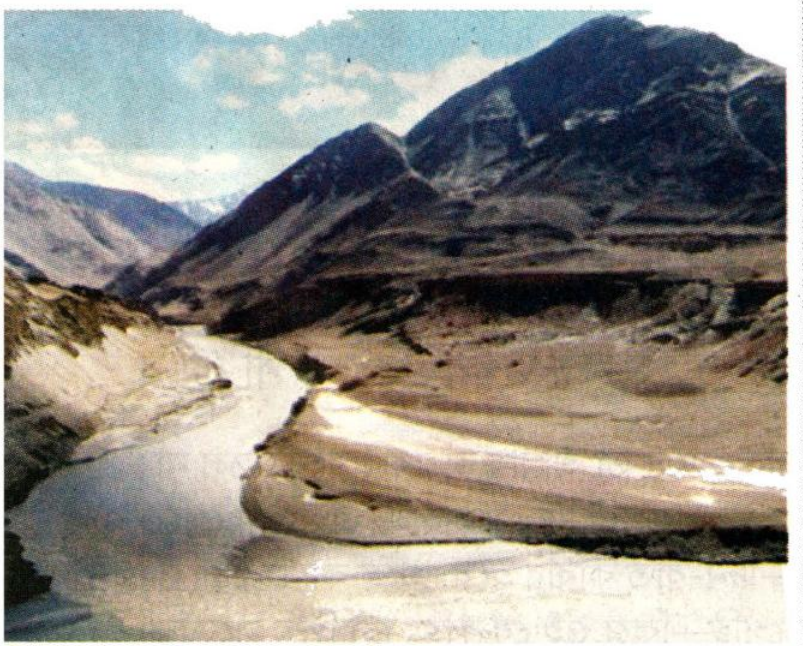

সেটা ছিল শীতকাল, তায় কাশ্মীরের ঠান্ডা। গাড়ি ছুটছে গন্তব্যের দিকে। পৌঁছোতে পৌঁছোতে প্রায় বিকেল গড়িয়ে গেল। দুটি উঁচু পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটা ছোট পাহাড় তার উপরিতলে একটা চমৎকার রেস্ট হাউস। ছবির মতো দেখতে। তার চার পাশে কেয়ারি করা ফুলের বাগান। সামনের লনটা দেখবার মতো। সেখানে চেয়ার টেবিল সাজিয়ে রাখা আছে। আমরা যেতেই, কেয়ারটেকার মানুষটি যেন তৈরিই ছিলেন, আমাদের জন্য পটভর্তি গরম চা ও বিস্কুট নিয়ে এলেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক মানুষ এই কেয়ারটেকারের বেশ বয়স হয়েছে। কিন্তু বেশ দৌড়াদৌড়ি করে কাজকর্ম করেন।

সবাই যে যার ঘরে ব্যাগ রাখতে চলে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল ক্যামেরা, লাইট আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি। আর খানিক বাদেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে। বাইরেটা সব মিলিয়ে দারুণ লাগছে। তাই আমি আমার ছোট্ট ন্যাপস্যাপটা পায়ের কাছে রেখে চা খাওয়া শেষ করেও বসেই থাকলাম। বসে রইলাম প্রকৃতির টানে, মেঘ-আকাশের রঙের টানে, পাহাড়ের আকর্ষণে।

ইতিমধ্যে সবাই সবার ঘর-টর দেখে নিয়েছে। আমারও একটা বিছানা বরাদ্দ হয়েছে। এক একটি ঘরে দু'জন করে থাকার ব্যবস্থা। আমরা ছিলাম ছ'জন। ঠান্ডায় আমি কোনও দিনও তেমন বিচলিত হইনি। অন্য দিকে, আমার সহযোগীরা বেশ কাবু। এক একজন দুটো তিনটে সোয়েটার জ্যাকেট ইত্যাদি চাপিয়ে ফেলেছে। একে একে সবাই ফিরে আসে বাইরের খোলা লনে। এদিকে হাওয়ার গতি বাড়ছে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, কীরে কেমন ঘরগুলো দেখলি? প্রত্যেকেই প্রায় একই সঙ্গে বলে, 'ঘর-বাথরুম খুবই ভাল, রুম হিটারও আছে। কিন্তু কোনও লেপ কম্বলের ব্যবস্থা নেই! খাট আছে, বালিশ আছে, তোশক আছে। কিন্তু লেপ-কম্বল কিছু একটা না থাকলে...?'

কথাটা শুনেই আমি ঘরের দিকে হাঁটা দিই। দেখি সত্যিই তো তেমন কিছু নেই। প্রত্যেকটা ঘরে আলাদা আলাদা করে যাই, পেল্লাই আলমারিগুলো খুলি। না কোথাও লেপ-কম্বল বলে কিছু নেই। এ তো বিরাট কাণ্ড! ছেলেগুলো খুবই কষ্ট পাবে! ডাকলাম সেই বয়ঃবৃদ্ধ কেয়ারটেকার হাসমত চাচাকে। সে হন্তদন্ত হয়ে এল। বললাম, 'কী চাচা গায়ে চাপানোর কিছু নেই এখানে?' সে বললে, 'আলবাত আছে।' বলেই সে খাটের ওপর পাতা ইয়া বড় একটা লেপ তুলে দেখাল। আমি বললাম, 'করেছেন কী চাচা! এ তো দেখি মহালেপ। সত্যিই মহালেপ। খাট জুড়ে পাতা ছিল। আমরা ভেবেছি গদি-তোশক হবে। প্রায় এক থেকে সোয়া ফুট মোটা সেই মহালেপ। রোগাসোগা, ছোটখাটো কারও ওপর চাপিয়ে দিলে একা তা সরিয়ে উঠতে পারবে না। আমরা সেই লেপ দেখে তো হেসেই খুন।

এদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে বাইরে। তার সঙ্গে কনকনে হাওয়া বইছে শব্দ করে। ফলে ঘরের মধ্যে থাকাই শ্রেয়। এ ধরনের শুটিং-এ গেলে আমি যে ঘরে থাকি সেখানেই সান্ধ্যকালীন আড্ডা বসে। পানাহারের সঙ্গে চলে গান-বাজনা। সে সময় আমার ব্যাগে ঘুঙুর আর একটা খঞ্জরি (ডুবকি)

থাকত সব সময়। এবারও তার অন্যথা হয়নি। চাচাকে রাতের খাদ্য-খাবারের অর্ডার দিয়ে আমরা বসলাম আড্ডা মারতে। নানা গল্প আর গান। এই দলে আমিই ছিলাম একমাত্র গায়ক যে নানা ধরনের গান কিছুটা সুরে বলতে পারে। তো গান শুরু করেছি। এদিকে চুকচুক করে মদ্যপান হচ্ছে। সবাই বেশ চনমনে। একমাত্র ব্যতিক্রম আমাদের রেকর্ডিস্ট ভাই গৌর পুস্তি। সে মদ্যপান করে না। কিন্তু সে ভয়ঙ্কর শীতকাতুরে। মাথায় টুপি, একাধিক মাফলার, সোয়েটার-জ্যাকেটে নিজেকে প্রায় কুমড়োপটাসের চেহারায় পরিণত করেছে।

গান চলেছে নানা সুরে তালে। সঙ্গীসাথীরাও তাল ঠুকছে। গান গাইতে গাইতে খাটের এক কোনায় বসে সবাইকে লক্ষ করছি। প্রত্যেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। হঠাৎ দেখি একটা হাতল ছাড়া চেয়ারে বসে গৌর কেমন যেন কিছুটা অস্বাভাবিক। গান চলছে তখন। এদিকে আমি দেখছি গৌরের চোখ দুটো প্রায় গোল গোল হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। হাতে গ্লাভস পরা গৌর গলার কাছে কিছু একটা হাতড়াচ্ছে। মিনিট খানেক কেটেছে কি কাটেনি। গৌর পুস্তি হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করে পপাত ধরণিতলে। সঙ্গে সঙ্গে গান-টান মাথায় উঠল। ধর ধর ধর, কী হল রে কী হল। গৌরের দম বন্ধ হয়ে আসছে। বললাম, দেখ শিগগিরি ওর গলায় মাফলারটা জড়িয়ে গেছে। সবাই মিলে খুলে দিলাম। একটার পর একটা জ্যাকেট, সোয়েটার গ্লাভস খুলে দিলাম। টেবিলের ওপরে রাখা জলের জগ থেকে জল নিয়ে মুখে ছেটালাম। খানিকটা জল মাথায় ঢাললাম। ক্রমে গৌরের জ্ঞান ফিরল। ততক্ষণে আমরা বুঝে গেছি যে বাতিকগ্রস্ত গৌর অতগুলো জামা-কাপড় আর দস্তানা নিয়ে গলায় একটার পর একটা মাফলার জড়িয়ে কোনও ভাবে গিট ফেলে দিয়েছিল। তাতেই ফাঁস লেগে এই অবস্থা। যাইহোক, সে রাত্রের মতো আড্ডা সাঙ্গ করে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। গৌর তখন কিছুটা ধাতস্থ। পরের দিন শুটিং-এ যাব তাই সবাই তাড়াতাড়ি উঠে তৈরি হয়ে নিচ্ছি। গৌর উঠতে পারছে না। ওর তখন ধুম জ্বর। আগের রাত্রের জল-চিকিৎসার রেশ। গৌরকে ঘরে রেখে শুটিং ইউনিটের ওষুধের কিট থেকে ওষুধ খাইয়ে আমরা বাকি পাঁচজন চললাম শুটিং করতে। কাজ বলে কথা। তা কি না করলে চলবে? আমরা ভেবেছিলাম গৌরের এই ঠান্ডায় মাথায় জল ঢালাতে হয়তো নিউমোনিয়া গোছের কিছু হতে চলল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ও সেরে ওঠে। দিন চারেকের মধ্যে। শুটিং-এও যোগ দেয়।

এদিকে শুটিং-এর কাজ প্রায় শেষ। যেদিন ফিরব তার আগের দিন উপত্যকার এক বিরাট খেত পেরিয়ে বিরাট বিরাট পোস্টে জোড়া পাওয়ার গ্রিডে মোটা মোটা তারের ছবি তুলতে গেছি। বিকেলের দিকে ক্যামেরা-স্ট্যান্ড ইত্যাদি গোছাতে গোছাতে খেয়াল করি কৃষকরা মাঠে কাজ করছে। কী তুলছে ওরা? কিছুটা হেঁটে গিয়ে দেখি বৃহৎ চেহারার হলুদ তুলছে। এট হলুদের খেত। সারা পৃথিবীতেই দেখেছি যে কৃষকদের কাছে তার ফলন থেকে চাইলে কেউ কম দেয় না। এটা বোধহয় দুনিয়ার কৃষক ঐক্যের গর্ব। আমি সে সময় রোজ সকালে কাঁচা হলুদ খেতাম। অনেকটা লোভের বশে একজনের কাছে হলুদ চাইতে সে এক ঝুড়ি হলুদ আমায় দিয়ে দিল। আমি তো মহাখুশি। ফিরে গেলাম

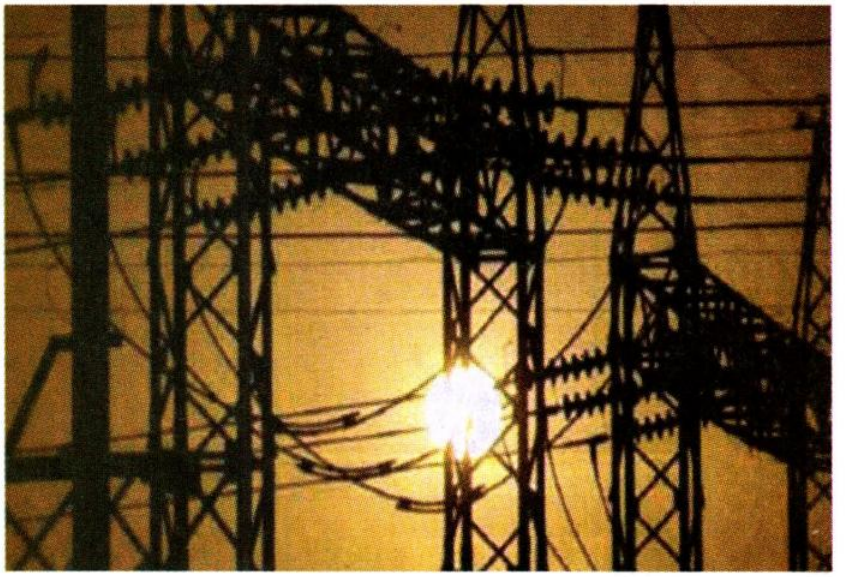

সেই রেস্ট হাউসে। পরের দিন আমাদের ফেরার পালা।

পরের দিন সকালে ভাড়া গাড়িতে সড়ক পথে এয়ারপোর্ট। সেখান থেকে দিল্লির উড়ান ধরব। পৌঁছোলাম সময় মতো। এরপর সিকিউরিটি চেক শুরু হল। আমাদের সমস্ত মালপত্র দেখে শুনে ছেড়ে দিল নিরাপত্তা কর্মীরা। শুধু আমার ব্যাগ সহ আমাকে আটক করল। নিয়ে গেল একটা ঘরে সেখানে একজন জাঠ অফিসার বসে। সে আমায় জিজ্ঞেস করল যে আমার ব্যাগে আমি কী নিয়ে যাচ্ছি? বললাম জামাকাপড় আর নিরীহ একটা সাঙ্গীতিক যন্ত্র। সে বলে, না এগুলো কী? এই বলে আমায় দেখায় আগের দিনের সেই কৃষকের কাছ থেকে নেওয়া হলুদ। আমি নানা ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করি যে আরে বাবা হলুদ মানে হলদি, মানে ইংরেজিতে যাকে বলে টারমারিক। কিছুই বুঝতে পারে না সে। আমাকে নিয়ে যায় তার থেকেও উচ্চপদস্থ এক পুলিশ আধিকারিকের কাছে। সে সর্দারজি। সব শুনে সে আমাকে বলে 'এটা কী খায়? তো ফির খাকে দিখাইয়ে।' আমি কচমচ করে একটা হলুদের কিছুটা কামড়ে চিবোতে থাকি। ওদিকে আমার সহযোগীরা ভাবে এ ব্যাটা নিশ্চয়ই কোনও গাঁজা বা চরস সংগ্রহ করেছে এই কাশ্মীর উপত্যকা থেকে, তাই ধরেছে। তারা এতটাই ভয় পেয়ে গেছে যে আমার খোঁজ-খবর নিতেও আসছে না। ক্রমে ফ্লাইটের টাইম হয়ে আসছে। সেই শিখ অফিসার তখনও বিশ্বাস করতে নারাজ। অবশেষে শেষ দুই অফিসারও হলুদ কিছুটা ভেঙে মুখে নিয়ে চিবোতে আরম্ভ করল। সর্দারদজীর কাঁচা-পাকা গোঁফ দাড়ি অসতর্কতাবশত হলুদ হয়ে গেল। ছোট অফিসারও বসের দেখাদেখি কিঞ্চিৎ খেয়ে মুখ হলুদ করল। অবশেষে বুঝতে পারল এ কোনও রাসায়নিক দ্রব্য নয়। নিতান্তই নিরীহ হলুদ! নিরাপত্তা রক্ষীদের এই কাণ্ডে আমি প্রায় হতবাক। অবশেষে আমায় ছাড়া হল। সেই অফিস ঘর থেকে আমরা যারা বেড়িয়ে এলাম তাদের প্রত্যেকেরই মুখ-ঠোঁট হলুদবর্ণ। তখন উড়ান ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে। ❖

আরব্য রজনী
চিত্রনাট্য: শিবপ্রসাদ সাহু
অঙ্কন: সুদীপ্ত কোলে ও সুমন সরকার
বাদশাহের রন্ধনশালায় মাছগুলো সবে কড়াইতে ভাজা শুরু হয়েছে, এমন সময় দেওয়াল ভেদ করে এক জলের বলয় থেকে অতিসুন্দরী মৎস্যকন্যা আবির্ভূত হল।
আমি তোমাদের উদ্ধার করতে এসেছি, চলো আমার সঙ্গে!
সঙ্গে সঙ্গে মাছগুলো জলের বলয়ে মিলিয়ে গেল।
তারপর মাছ সহ মৎস্যকন্যা উধাও হয়ে গেল।
তা কী করে সম্ভব! এ নিশ্চয় জেলেটার কারসাজি, তাকে ডেকে পাঠাও।
সত্যি করে বলো, এগুলি কোন জলাশয়ের মাছ?
আজ্ঞে, আপনার সলতানিয়াতের পশ্চিমদিকে যে চার পাহাড়ে ঘেরা জলাশয় আছে, আমি সেখান থেকেই মাছগুলো ধরেছি।
পরেরদিন, বাদশাহ জেলেকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলেন সেই জলাশয়ের উদ্দেশে।
আমি নিজের চোখে এর আসল রহস্য দেখতে চাই।
আমরা প্রায় গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি।
তাই নাকি!
আমি আজ রাতেই এর একটা বিহিত করে ছাড়ব।

পাহাড় জঙ্গল ঘুরে ঘুরে শেষরাতে বাদশাহ এক প্রাসাদের সামনে এসে পৌঁছোয়।
ভীষণ পিপাসার্ত বাদশাহ কোনও লোক বা প্রহরী দেখতে না পেয়ে নিজেই প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করল।
এই শূন্যপুরীতে কেউ যেন করুণ সুরে গান করছে।
আপনি কি বলতে পারেন কোন জলাশয়ে রঙিন মাছগুলো থাকে? আর আপনার কি এমন দুঃখ যে আপনি এমন দুঃখের গান গাইছেন?
আমি একসময় সুলতান ছিলাম কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আমার শরীরের অর্ধেকটা পাথরে পরিণত হয়েছে, ফলে আমি হাঁটাচলা করতে পারি না।
সুলতান তা দেখে অবাক হয়ে যায়।
আমি এই সালতানিয়ার সুলতান। আপনি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারেন কে আপনার এই অবস্থা করেছে।
আমি বেশ সুখে সাচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছিলাম। একদিন আমি দুই দাসীর কথোপকথন শুনতে পেলাম।
এমন সুন্দর সুলতান আর বেগম কিনা এক ক্রীতদাসের সঙ্গে ব্যাভিচারিতায় লিপ্ত। সেইজন্যই বেগম প্রত্যেক রাতে প্রাসাদ থেকে ছদ্মবেশে বেরিয়ে যায়।
তারপর কোথায় যায়? কে সেই ক্রীতদাস?

চলবে

শেষ পাতে

বিশ্বকর্মা ও মাতাল উৎসব

সুব্রত সেন

সে অনেক বছর আগে মনে আছে, ক্রিসমাসের ঠিক আগের দিন, যাকে ইংরাজিতে ক্রিসমাস বলা হয়ে থাকে, আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেবার জার্মানির কোলন শহর থেকে ট্রেনে চেপে চলে গেছিলাম বন শহরে, যে শহরের কথা সৈয়দ মুজতবা আলীর 'চাচা কাহিনী'-তে পড়েছিলাম। ক্রিসমাস ইভ ব্যাপারটা ইউরোপে কিন্তু বেশ গোলমেলে, এখানকার মতো এমন সকলে রাস্তায় নেমে ক্রিসমাস উদ্‌যাপন করে না, ওরা যেটা করে সেটা হল, যে যার নিজের মতো প্রিয়জনের সঙ্গে একান্তে সময় কাটায়। ফলে রাস্তা থাকে একেবারে শুনশান, নিঃশব্দ। আমাদের কলকাতা শহরের মতো মানুষের ঢল নামে না রাস্তায় রাস্তায়।

ওই শুনশান শহরে দেখেছিলাম কাকে বলে মাতালদের দৌরাত্ম্য। দেখলাম, বন স্টেশনে বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো অনেক মাতাল, তারা গলা অবধি মদ খেয়ে রীতিমতো যাকে বলে বাওয়ালি করছে রাস্তায়। ঠিক এই রকম বাওয়ালি সাধারণত আমরা দেখতে অভ্যস্ত নই, একমাত্র বিশ্বকর্মা পুজো ছাড়া। একটা সময়ে পুজোর ভাসানের দিন অনেক মাতাল দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু আজকাল সবকিছু বড় অর্গানাইজড, বাবুঘাটে মাতাল দেখলেই পুলিশ বড় ঝামেলা করে। তাই অবস্থা বুঝে মাতালরা ওই ভাসানের দিনে অনেক সংযত হয়ে পড়েছে। আর আজকাল মাতালদের একমাত্র ছাড় যে দিনটায়, তা হল বিশ্বকর্মা পুজো।

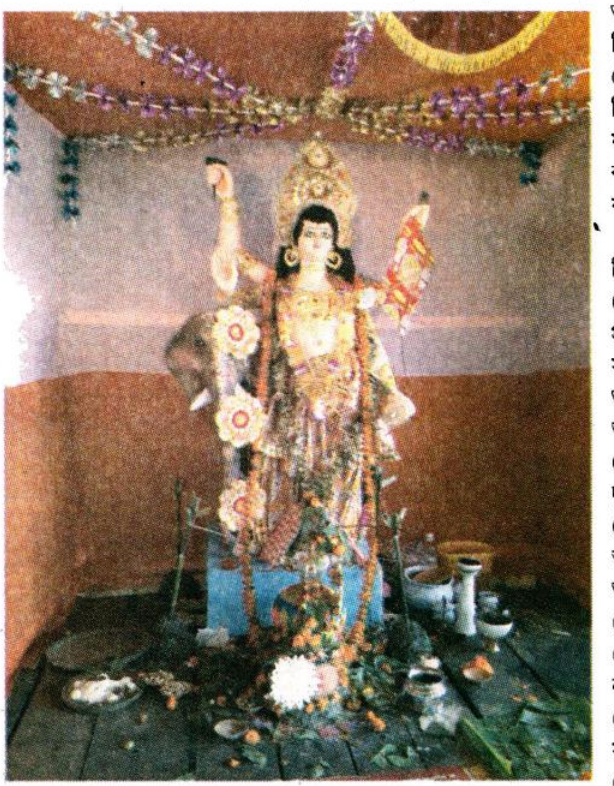

বিশ্বকর্মা এক অদ্ভুত পুজো। কলকারখানা বন্ধ, শহরের রাস্তায় গাড়িঘোড়াও চলবে না। এ দিনে কলকাতার রাস্তায় হরেক মাতালের দেখা মেলে।

এই বিশ্বকর্মা এক অদ্ভুত পুজো। সেই দিনে কলকারখানা-টারখানা সব বন্ধ, এমনকী শহরের রাস্তায় গাড়িঘোড়াও চলবে না খুব বেশি। এই দিনে কলকাতার রাস্তায় হরেক রকম মাতালের দেখা মেলে। যেহেতু রাস্তায় গাড়ি চলে কম, তাই গাড়ি চাপা পড়ার ভয়ও নেই খুব বেশি। এই দিনটা ফলত এখানকার অঘোষিত মাতাল উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও একটা অজ্ঞাত কারণে পুলিশ এই সব মাতালদের বিশেষ কিছু বলে না। পাত্তাও দেয় না।

অনেক বছর আগে বিশ্বকর্মা পুজো ছিল ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব। এখন কিন্তু আর খুব একটা ঘুড়ি ওড়ে না আকাশে। এর কারণ, বিশ্বকর্মা পুজো ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আজকাল দেখা যাচ্ছে বর্ষাকাল তখনও বিদায় নিচ্ছে না পুরোপুরি। ফলে লোকে আর কীই বা করবে, ঘুড়ি যখন ওড়ানোই যাচ্ছে না, তখন মদই সই।

নিজের চোখে দেখা, বিশ্বকর্মা পুজোর আগের রাত্তির থেকে শুরু হয় মদ খাওয়ার প্রস্তুতি। একদিকে যদি ঠাকুর সাজানো চলছে, অন্যদিকে তবে বোতল জমা হচ্ছে আসল ভক্তদের জন্য। সকালবেলা কোনও রকমে পুজো, তারপর দুপুরে ভোগের আয়োজন। ওই ভোগ খাওয়া চালু হওয়ার প্রায় আগে ভাগেই টলায়মান ভক্তকুল। এবং এই দুপুরের ভোগের পর পৃথিবী উলটে গেছে বললেও ভুল হয় না। নানা রকমের মাতাল রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, তারা কখনও সদলবলে, কখনও বা একা। কেউ কেউ উলটে পড়ে থাকে রাস্তার ধারে। রিকশা স্ট্যান্ডে রিকশা পাওয়া যায় না, ট্যাক্সির দেখা মেলে না। সকালের দিকে কলাগাছ লাগিয়ে তাও যে কয়েকটা বাস বেরিয়েছিল, সন্ধের পর থেকে তারাও অপ্রতুল। হাতির পিঠে চেপে বসে বিশ্বকর্মা শুধু ভক্তদের দেখে যান। তিনি জানেন, এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে পরের দিন, যখন দধিকর্মা মাখা হবে। ওই দধিকর্মার পরে বিসর্জন সেরে একটু একটু করে কাজে ফিরবে সকলে, ততক্ষণ অবধি চলবে মাতালদের বাৎসরিক উৎসব। ❖

অষ্টমীর অঞ্জলী হোক বা দশমীর সিঁদুরখেলা,

আপনার পুজোর বাজারের একমাত্র ঠিকানা ...

আগরওয়ালা ষ্টোর্স-এর
নবতম সংযোজন

আনন্দ

শাড়ী
সালোয়ার স্যুট
কূর্তি

ঐতিহ্য, পরম্পরা ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে
সর্বভারতীয় শাড়ীর অনন্য সম্ভার

ষ্টেশন রোড , কাঁচরাপাড়া, আগরওয়ালা ষ্টোর্স- এর বিপরীতে

পরিবারের সুখ ও শান্তি ঐশ্বর্যের আরেক নাম

শ্রী ধন বর্ষা লক্ষ্মী কুবের যন্ত্র

শারদীয়ার
বিশেষ
অফার চলছে

As Seen on TV
Price ~~3400~~/-
Now Order
₹1690/-

An ISO Certified

মহাপঞ্চধাতু দ্বারা নির্মিত শ্রী ধনলক্ষ্মী যন্ত্রের উপকারিতা

১. টাকা পয়সা সর্বদা অটল থাকে মা লক্ষ্মীর কৃপায়।
২. সংসারে দুর্ভাগ্য অসুখ বিসুখ প্রবেশ করবে না।
৩. ঋণ থেকে মুক্তি পাবেন।
৪. শিক্ষা দীক্ষাতে উন্নতি লাভ ও সম্মান প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।
৫. শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুখ পাবেন।
৬. ধন দৌলত ক্ষয় হয় না হঠাৎ হঠাৎ শুভ খবর এবং ধনপ্রাপ্তি।

পশ্চিমবঙ্গে ৫০ লক্ষ মানুষের জীবনকে পাল্টে দিয়েছে।

OM SKY SHOP

9062847061/ 9748112584/ 9748112732/ 56
Email : omxskysnop@gmail.com (Order time- 6am to 11 pm)